সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আনন্দ
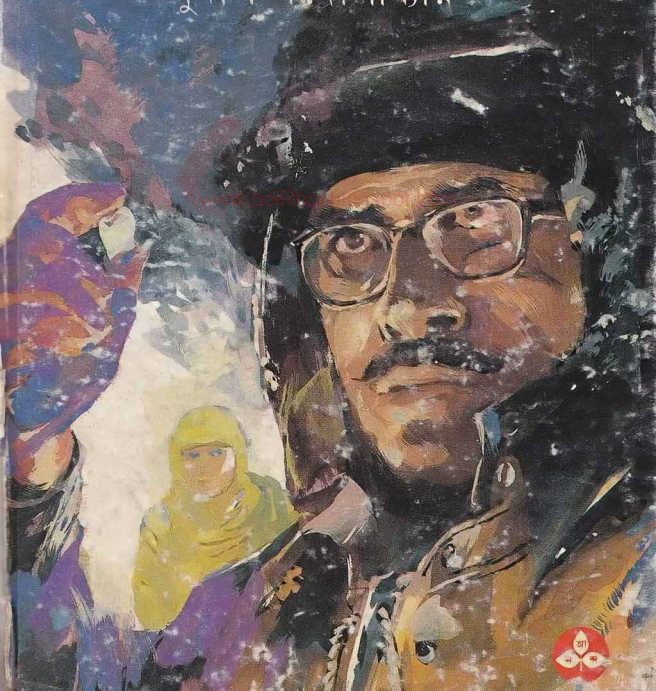
উঃ, কী শীত, কী শীত ! এখানকার হাওয়ার যেন ভয়ঙ্কর দাঁত আছে, শরীর কামড়ে ধরে একেবারে। সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে একবার কাশ্মীরেও গিয়েছিল, কিন্তু সেখানকার শীতের সঙ্গে এখানকার শীতের যেন তুলনাই হয় না।

হাওয়ার ভয়ঙ্কর দাঁত আছে, এ কথাটা সন্তুরই মনে পড়েছিল। গরম জামা-কাপড় দিয়ে শরীরের সব জায়গা ঢাকা যায়, শুধু নাকটা ঢাকা যায় না। আর কোনও জায়গা খালি না পেয়ে হাওয়া যেন বারবার সন্তুর নাকটা কামড়ে ধরছে। এবং এক সময় মনে হচ্ছে নাকটা আর নেই। গ্লাভস পরা হাত দিয়ে সন্তু মাঝে-মাঝে দেখছে যে, হাওয়াতে তার নাকটা সত্যিই কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে কি না।

তারপর এক সময় সে হঠাৎ বলে উঠল, "দূর ছাই ! আমিও আবার দাঁতের কথা ভাবছি কেন ! আর ভাবব না, কিছুতেই ভাবব না।"

একটা দাঁতের জন্যই এবার এতদূর ছুটে আসা।

জায়গাটার নাম গোরখশেপ। এসব জায়গার নাম কে রাখে কে জানে ! জায়গা মানে কী, বাড়িঘর গাছপালা কিছুই নেই, শুধু পাথর আর বরফ। তবে, চারদিকের উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মধ্যে এই

জায়গাটা খানিকটা সমতল। এখানে-সেখানে পড়ে আছে কিছু পোড়া কাঠ, আর অনেক খালি-খালি টিনের কৌটো, তার কোনওটা দুধের, কোনওটা কড়াইশুঁটির, কোনওটা শুয়োরের মাংসের। মাঝে-মাঝেই এই জায়গায় এভারেস্ট-অভিযাত্রীরা তাঁবু গেড়ে থাকে। কয়েকদিন আগেও এখানে ছিল ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের বেস ক্যাম্প।

সামনেই একটা ছোট পাহাড়, তার নাম কালাপাথর। সেটার ওপরে উঠলেই এভারেস্ট-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। এভারেস্ট! পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ! সন্তু রোজ সেই এভারেস্ট-শৃঙ্গকে দেখছে! তার বয়েসি আর কোনও বাঙালির ছেলে এভারেস্টকে এত কাছ থেকে দেখেনি, নিশ্চয়ই দেখেনি!

সন্তু এবার সঙ্গে এনেছে একটা ক্যামেরা, সে নিজে এভারেস্টের ছবি তুলেছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেই ছবির রীল ডেভেলপ আর প্রিন্ট করাবার জন্য সন্তু ছটফট করে। কিন্তু কবে যে কলকাতায় ফেরা হবে, তার কিছুই ঠিক নেই। এক-এক সময়, বিশেষত রাত্তিরের দিকে, মনে হয়, হয়তো আর ফেরাই হবে না কোনওদিন।

দিনের বেলা ভয় করে না, শীতও তেমন বেশি লাগে না। যখন রোদ ওঠে, তখন বরফের ওপর রোদ ঠিকরে এমন ঝকমক করে যে, খালি চোখে সেদিকে তাকালে যেন চোখ ঝলসে যায়। সেই জন্য সন্তুকে দিনের বেলা রঙিন চশমা পরে থাকতে হয়। কাকাবাবুও সেই রকম চশমা পরেন। অথচ নেপালিরা দিব্যি খালি চোখেই সব সময় ঘোরাফেরা করে, তাদের কিছু হয় না।

এখানে সন্তুদের সঙ্গে সাতজন নেপালি রয়েছে, দু'জন শেরপা আর পাঁচজন মালবাহক। তারা থাকে পাশের দুটো তাঁবুতে। সন্তু আর কাকাবাবু থাকেন একটা পাথরের গম্বুজে।

এই জনমানবশূন্য জায়গাটায় এরকম একটা পাথরের গম্বুজ কে বানিয়েছিল, তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। গম্বুজটা প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। মোটা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। একতলাটা বেশ চওড়া, তাতে দু'জন মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ভেতর দিয়েই উঠে গেছে সিঁড়ি, একদম চূড়ার কাছে একটা ছোট্ট চৌকো জানলা, সেখান দিয়ে আসে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু সে জানলাটাকে কিছু দিয়ে বন্ধ করার উপায় নেই, তা হলে ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে হবে।

শেরপারা বলে যে, এই গম্বুজটা হাজার-হাজার বছর ধরে রয়েছে এখানে। কিন্তু কাকাবাবুর ধারণা, এটার বয়েস একশো বছরের বেশি হবে না। এবং এটা নিশ্চয়ই কোনও সাহেবের তৈরি। গম্বুজটাতে ঢোকার জন্য রয়েছে একটা শক্ত লোহার দরজা। খুব সম্ভবত কোনও সাহেব এখানে বসে এভারেস্টের দৃশ্য দেখবার জন্য এটা বানিয়েছিল। পাহাড় সম্বন্ধে উৎসাহ বা পাগলামি সাহেবদেরই বেশি।

কিন্তু ওপরের জানলাটা দিয়ে এভারেস্ট দেখা যায় না। কালাপাথর নামের ছোট পাহাড়টায় একটুখানি আড়াল পড়ে যায়। তাও কাকাবাবু বলেন, এখন দেখা না-গেলেও একশো-দেড়শো বছর আগে হয়তো এখান থেকেই এভারেস্ট দেখা যেত। এখানকার ভূপ্রকৃতির মধ্যে নানারকম পরিবর্তন চলছে অনবরত। কোনও পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়েছে, কোনও জায়গা বসে যাচ্ছে, কোনও জায়গায় হয়তো হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা থেকে একটা নদী এসে বইতে শুরু করেছে।

সন্তু নিজেই তো এরই মধ্যে একটা দুর্দান্ত ব্যাপার দেখেছিল। সেটা অবশ্য এই জায়গা থেকে নয়। সেই জায়গাটার নাম কুনড়,

অনেকটা পেছন দিকে।

কুন্ড একটা ছোটখাটো গ্রামের মতন, একটা ছোট হাসপাতাল আর ইস্কুলও আছে। সেখানে সন্তুরা দুদিন ছিল বিশ্রাম নেবার জন্য। একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ এমন সাঙ্ঘাতিক শব্দ হল যেন দশখানা জেট প্লেন এক সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কিছুই নেই। আকাশে মেঘও নেই যে, বজ্রপাত হবে। কিছু নেপালি যেন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে। কাকাবাবু বসে ছিলেন সামনের মাঠে একটা কাঠের টুলে, তিনি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে সন্তুকে ডাকলেন কাছে আসবার জন্য।

সন্তু বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গেল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "ওই দ্যাখ ! এরকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা !"

সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখেছিল যে, অনেক দূরে, অন্তত পাঁচ ছ'মাইল তো হবেই, এক জায়গায় পাহাড় জুড়ে শুধু সাদা রঙের ধোঁয়া, আর সেই কান-ফাটানো শব্দটা আসছে ওখান থেকেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "ওখানে কী হচ্ছে কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "বুঝতে পারলি না ?" আভালান্‌ ? পাহাড়ের মাথা থেকে হিমবাহ ভেঙে পড়ছে !"

বরফ ভাঙার ওই রকম প্রচণ্ড শব্দ হয় ! হাজার-হাজার লোহার হাতুড়িতে ঠোকাঠুকি করলেও এত জোর শব্দ হবে না। সাদা রঙের ধোঁয়া ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। ঝড়ের মতন হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছিল সন্তুদের গায়ে। দু'ঘণ্টার মধ্যেও সেই শব্দ থামল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, ওই হিমবাহ ভেঙে গড়িয়ে এখানে চলে আসতে পারে না ?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আসতে পারে। মাঝখানে একটা নদী আছে। সেটা যদি ভরে যায়—"

সন্তু বলেছিল, "এখানে এসে পড়লে কী হবে ?"

কাকাবাবু খুব শান্তভাবে বলেছিলেন, "কী আর হবে, আমরা চাপা পড়ে যাব। মাঝে-মাঝেই তো কত গ্রাম এইভাবে চাপা পড়ে যায়।"

কাকাবাবুর সেই উত্তরটা এখনও সন্তুর কানে বাজে। ভয় বলে কোনও জিনিসই যেন কাকাবাবুর নেই। হিমবাহ এসে চাপা দিয়ে দেওয়াটাও যেন কাকাবাবুর কাছে খুব একটা সাধারণ ব্যাপার।

এখানে এই গম্বুজের মধ্যে শুয়ে থেকেও সন্তু মাঝে-মাঝে দূরের কোনও জায়গার গুম্‌ গুম্‌ শব্দ শুনতে পায়। কোথাও হিমবাহ ভাঙছে। যদি এখানেও এসে পড়ে ? হিমবাহের এমনই শক্তি যে, এই শক্ত পাথরের গম্বুজটাকেও নিশ্চয়ই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিংবা যদি নাও ভাঙে, যদি গম্বুজটার চূড়া পর্যন্ত বরফে ঢেকে যায় ? তাহলেও তো তারা এখান থেকে আর কোনওদিন বেরুতে পারবে না !

গম্বুজটা অন্য সময় নেপাল গভর্নমেন্ট বন্ধ করে রাখেন। কাকাবাবু বিশেষ অনুমতি নিয়ে এটা খুলিয়ে এখানে আস্তানা গেড়েছেন। এখানে সন্তুদের ছ'দিন কেটে গেল।

দিনের বেলা তবু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করা যায়। সন্ধে হয়ে গেলেই আর কিছু করার নেই। গম্বুজের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে চেন টেনে দিলে সন্তুর চেহারাটা হয়ে যায় একটা পাশবালিশের মতন। সেই অবস্থায় আর নড়াচড়া করা যায় না।

কিন্তু সন্ধে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ঘুমিয়ে পড়া যায় না। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়তে

হয়, কিন্তু বই পড়বার উপায় নেই। ঘরে আলো আছে যথেষ্ট। ব্যাটারি দেওয়া এক ধরনের হ্যাজাক লণ্ঠন এনেছেন কাকাবাবু বিলেত থেকে, তাতে ঠিক নিয়ন আলোর মতন আলো হয়। গম্বুজের মধ্যে সেই আলো জ্বলছে। বইটা পাশে রেখে কাত হয়ে পড়া যায়, কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে হাত বার করা যায় না বলে বইয়ের পাতা ওল্টানো যায় না। বারবার চেন খুলে হাত বার করতে গেলেই ভেতরে হাওয়া ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য এমন শীত করে যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

তার সমস্ত সোয়েটার, কোট, মাফলার গায়ে দিয়েও সন্তু কিছুতেই সন্ধে সাড়ে সাতটার পর আর স্লিপিং ব্যাগের বাইরে থাকতে পারে না। কিন্তু কাকাবাবু পারেন। কাকাবাবুর শরীরে যেমন ভয় নেই, তেমনি বোধহয় শীতবোধও নেই। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাকাবাবু চামড়ার জ্যাকেট গায়ে দিয়ে গম্বুজের চূড়ার কাছে বসে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকেন বাইরে। কখনও-কখনও মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙলেও কাকাবাবু স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে একবার গম্বুজের ওপরটা থেকে ঘুরে আসেন। একজন খোঁড়া লোকের এতখানি উৎসাহ আর ক্ষমতা, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ সন্তু জুলজুল করে চেয়ে থাকে আর কলকাতার কথা ভাবে। সাড়ে সাতটা, আটটা মোটে বাজে, এখন কলকাতায় কত হৈ-চৈ। কতরকম গাড়ির আওয়াজ, রাস্তাঘাট মানুষের ভিড়ে গমগম করে। আর এখানে কোনও রকম শব্দ নেই। এ জায়গাটা যেন পৃথিবীর বাইরে।

কাকাবাবু নীচে না এলে বাতিটা নেভানো যাবে না। চোখে আলো লাগলে কাকাবাবুর ঘুম হয় না বলে উনি হ্যাজাকটা নিভিয়ে দেন। কিন্তু ওটা সারা রাত জ্বালা থাকলেই সন্তুর বেশি ভাল

লাগত। অন্ধকার হলেই শরীরটা কেমন যেন ছমছম করে। ঠিক ভয় নয়, আন্দামানে গিয়ে সন্তু আর কাকাবাবু, যেরকম বিপদে পড়েছিল, সেরকম কোনও বিপদের সম্ভাবনা তো এখানে নেই। হিমবাহ ভেঙে আসার একটা ভয় আছে বটে, কিন্তু একশো বছর এখানে এই গম্বুজটা টিকে আছে যখন, তখন হঠাৎ এই সময়েই হিমবাহ এসে এটাকে গুঁড়িয়ে দেবে, তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। অবশ্য কিছুই বলা যায় না। তবু সেজন্যও নয়, এত বেশি চুপচাপ বলেই সব সময় একটা ভয়ের অনুভূতি থাকে।

কাকাবাবুর যে কী উদ্দেশ্য, তা সন্তু এখনও কিছুই বুঝতে পারছে না। এখানে দিনের পর দিন এই গম্বুজের মধ্যে বসে থাকার কী মানে হয়! শেরপা দু'জন আর মালবাহকরাও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। এই নেপালিরা খুব কাজ ভালবাসে, পরিশ্রম করতেও পারে খুব, এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা যেন ওদের সহ্য হয় না। গত পাঁচ ছ'দিন ধরে ওরা শুধু রান্না করে খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। এদের সর্দারের নাম মিংমা, তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে সন্তুর। মিংমার বয়েস ৩৪/৩৫ হবে, ঠিক যেন বাদামি রঙের পাথর দিয়ে গড়া ওর শরীর। এর আগে একটি অভিযাত্রী-দলের সঙ্গে এভারেস্টের খুব কাছে ও পৌঁছেছিল। ওর খুব শখ একবার এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার। মিংমা সন্তুকে ডেকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, "আংকেলের কী মতলব? আংকেল এখানে থেমে রইলেন কেন? এভারেস্টের দিকে যাবেন না?"

সন্তু এসব কথার কিছুই উত্তর দিতে পারে না।

দিনের বেলা রোদ থাকলে সন্তু এদিক-ওদিক বেড়াতে যায়। কিন্তু কাকাবাবু তাকে একলা ছাড়েন না কক্ষনো। একজন শেরপাকে সঙ্গে রাখতেই হয়। পাহাড়ি রাস্তায় যে-কোনও সময় বিপদ হতে পারে। প্রত্যেকদিন সন্তু কালাপাথর পাহাড়টায় উঠে

একবার এভারেস্ট দেখে আসবেই। এভারেস্টের দিকে তাকালেই যেন বুক কাঁপে। ওই পাহাড়ের চূড়াতেও মানুষ পা রেখেছে, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। চাঁদের ওপরেও তো মানুষের পায়ের ধুলো লেগেছে, চাঁদের দিকে তাকালে কি তা বোঝা যায়? কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এই বরফের রাজ্য পেরিয়ে ওই এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে চান? এ যে অসম্ভব ব্যাপার।

রাতগুলো যেন আর কাটতেই চায় না। কাকাবাবু গম্বুজের চূড়ায় বসে থাকেন আর সন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে।

যে কাঠের বাক্সগুলোতে করে জিনিসপত্র আনা হয়েছিল, তারই একটা খালি বাক্স দুই বিছানার মাঝখানে রাখা হয়েছে একটা টেবিলের মতন করে। হ্যাজাক বাতিটা তার ওপরেই রাখা। তার পাশে একটা ঘড়ি, টর্চ আর একটা ছোট্ট চৌকো কাচের বাক্স। অনেকটা গয়নার বাক্সের মতন, তার মধ্যে গয়নার বদলে রয়েছে একটা মানুষের দাঁতের মতন জিনিস। সেই দাঁতটার দিকে তাকালেই সন্তুর গা শিরশির করে। অথচ সাত রাজার ধন এক মানিকের মতনই কাকাবাবু সব সময় ওই দাঁতটাকে কাছে-কাছে রাখেন আর মাঝে-মাঝেই ওটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত, ঠিক যেন ধ্যান করছেন, এইভাবে।

ওই দাঁতটার একটা মস্ত বড় ইতিহাস আছে।

কলকাতায় কিন্তু কাকাবাবু ওই দাঁতটার কথা কিছুই বলেননি সন্তুকে। সন্তুও জানতই না যে, কাকাবাবু এবার বিলেত থেকে

ওই দাঁতটা নিয়ে এসেছেন। বিলেত থেকে সবাই কত ভাল-ভাল জিনিস আনে, আর কাকাবাবু এনেছেন একটা মরা মানুষের দাঁত!

আন্দামান অভিযানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে এখন কাকাবাবুর ডাক আসে। জেনিভায় এক অ্যানথ্রপলজিক্যাল কনফারেন্সে কাকাবাবু বক্তৃতা দিয়ে এলেন মাস ছয়েক আগে। তারপরই গিয়েছিলেন বিলেতে। তারপর কিছুদিন কাকাবাবু বইপত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন একেবারে। তখনই সন্তুর মনে হয়েছিল, কাকাবাবু বোধহয় আবার নতুন কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন।

একদিন হঠাৎ তিনি সন্তুকে ডেকে বলেছিলেন, "কী রে, এভারেস্টে যাবি? আমি যাচ্ছি, যদি সঙ্গে যেতে চাস্—"

শুনেই সন্তুর বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। এভারেস্ট!

প্রথমে সন্তু যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। এভারেস্টে যাওয়া কি যেমন-তেমন কথা?

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, তুমি, মানে ইয়ে, মানে তুমি সত্যিই এভারেস্টে যাচ্ছ?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে বলব নাকি তোকে?"

একজন খোঁড়া মানুষ, যিনি ক্রাচে ভর না দিয়ে চলতে পারেন না, তাঁর মুখে এভারেস্ট যাওয়ার কথা শুনলে কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? অথচ কাকাবাবু আজে-বাজে কথাও বলবেন না ঠিকই। তখন সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু তাহলে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার কোনও অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই। সন্তু তো তবে যাবেই কাকাবাবুর সঙ্গে, এই সুযোগ কি সে ছাড়তে পারে?

নিউজিল্যান্ডের হিলারি আর আমাদের দার্জিলিংয়ের

তেনজিং,—এই দু'জনই মানুষজাতির মধ্যে প্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা এভারেস্টের চূড়ায় পা দেন। তারপর আমেরিকান, ফরাসি, জাপানি আরও কত জাতির লোক এভারেস্টে উঠেছেন। এমন-কী, আমাদের ভারতীয়দের মধ্যেও এক জন না দু'জন উঠেছেন, কিন্তু কোনও বাঙালি তো এখনও সেখানে যেতে পারেনি! সন্তু উঠতে পারলে সারা পৃথিবীতে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর কোনও জাতেরই পনেরো বছরের কোনও ছেলে এভারেস্টে উঠতে পারেনি। আর কাকাবাবু যদি জেদ ধরেন, তা হলে তিনি উঠবেনই, সন্তুর এ-বিশ্বাস আছে। তা হলে কাকাবাবুও এক হিসেবে বিশ্বে প্রথম হবেন। কারণ, এক পা খোঁড়া, ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে চড়ার কথা কেউ আগে কল্পনা করারও সাহস পায়নি।

সন্তু অতি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়েছিল তো বটেই, তার ওপর এভারেস্ট সম্পর্কে তার জ্ঞান দেখাবার জন্য বলেছিল, "কাকাবাবু, এভারেস্ট তো আবিষ্কার করেছিলেন একজন বাঙালি, তাই না? সাহেবরা তাঁর নামটা দেয়নি—"

কাকাবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "এভারেস্ট আবার কেউ আবিষ্কার করবে কী? এটা কি একটা নতুন জিনিস? তবে, এটাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া, সেটা ঠিক করার ব্যাপারে একজন বাঙালির খানিকটা হাত ছিল বটে।"

সন্তু বলেছিল, "আমি তো সেই কথাই বলছি। তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার। ওই চূড়াটার নাম এভারেস্ট না হয়ে রাধানাথ হতে পারত।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "রাধানাথ শিকদার সার্ভে অফিসে কাজ করতেন। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গের তখন কোনও নামই ছিল না। মিঃ এভারেস্ট ছিলেন ওই সার্ভে অফিসের বড় সাহেব।

তাঁর নামেই ওই শৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, ওই রাধানাথ শিকদার তো আর এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেননি, তা হলে তিনি কী করে বুঝলেন যে ওইটাই সবচেয়ে বেশি উঁচু?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "পাহাড়ে না উঠেও পাহাড় মাপা যায়। ছোটখাটো পাহাড় মাপে সেগুলোর ছায়া দেখে। তা ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনেক অঙ্ক কষতে হয়। রাধানাথ শিকদার অবশ্য এক সময় দেরাদুনে থাকতেন, তখন পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরেছেন। কিন্তু তুই যাকে "আবিষ্কার" বললি, সেটা হয়েছিল এই কলকাতায়। অঙ্ক কষতে-কষতে তিনি হঠাৎ একদিন দেখলেন যে, এই যে একটা নাম-না-জানা পাহাড়, তখন কাগজপত্রে এটার নাম ছিল পীক নাম্বার ফিফটিন, এটারই উচ্চতা উনত্রিশ হাজার ফুটের বেশি, এত উঁচু পাহাড় আর পৃথিবীতে নেই। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর নতুন বড় সাহেবকে খবর দিলেন। এভারেস্ট সাহেব অবশ্য তখন রিটায়ার করেছেন, তবু তাঁর নামেই শিখরটির নাম রাখা হল।"

সেদিন এভারেস্ট সম্পর্কে আরও অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। তারপর ক'দিন কাকাবাবু একেবারে চুপচাপ। যেন ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেছেন। হঠাৎ একদিন কাকাবাবু চলে গেলেন দার্জিলিং। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। সেখান থেকে ফিরে গভর্নমেন্টের নেমন্তন্ন পেয়ে আবার চলে গেলেন জার্মানি। দেড়মাস বাদে যেদিন তিনি কলকাতায় ফিরলেন, তার পরদিনই সন্তুদের বাড়িতে এলেন তেনজিং। কী করে যেন কথাটা জানাজানি হয়ে গেল, সন্তুদের বাড়ির সামনে সেদিন সাঙ্ঘাতিক ভিড় জমে গিয়েছিল। তেনজিংকে একটু দেখবার জন্য, তাঁর সই নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তেনজিংয়ের সঙ্গে কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে কথা বললেন অনেকক্ষণ। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। সন্তু ঘুরঘুর করছিল কাকাবাবুর ঘরের কাছে, কিন্তু কোনও কথাই শুনতে পায়নি। তেনজিং বিদায় নেবার সময় বন্ধুর মতন কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেছিলেন, "গুড লাক! আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী! আপনি পারবেন, তখন সবাই বুঝে যাবে, আমার কথা ঠিক কি না! বয়েস হয়েছে, না হলে আপনার সঙ্গে আমিও যেতাম!"

ইস্কুলের বন্ধুদের কাছে সন্তু আগেই বলে ফেলেছিল যে, এবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে যাবে। সবাই খুব হেসেছিল। বন্ধুদের এই একটা দোষ, কোনও কথাই ওরা আগে থেকে বিশ্বাস করে না। তেনজিং নোরগে ওদের বাড়িতে আসবার পর সন্তু আবার বলেছিল, "দেখলি তো? আমার কাকাবাবুর সঙ্গে কত লোকের চেনা। তেনজিং নিজে আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন!"

সন্তুদেরই স্কুলে পুজোর ছুটি শুরু হল যেদিন, সেদিনই কাকাবাবু বলেছিলেন, "সন্তু, তৈরি হয়ে নাও, সামনের সোমবার আমরা বেরিয়ে পড়ছি।"

সন্তুর ধারণা ছিল এভারেস্ট অভিযানে যেতে হলে বিরাট দলবল লাগে, অনেক জিনিসপত্র আর তাঁবু-টাঁবু নিয়ে যেতে হয়। সেসব কিছুই নয়, কাকাবাবু শুধু সন্তুকে নিয়ে প্লেনে চেপে চলে এলেন নেপালে। কাঠমাণ্ডু শহরে ছ'দিন চুপচাপ সন্তু একটা হোটেলে বসে কাটাল। কাকাবাবু একা-একা ঘোরাঘুরি করলেন নানা জায়গায়। সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু নিশ্চয়ই নেপালে এসে দলবল জোগাড় করছেন।

তাও হল না। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবু

বললেন, "বাক্স গুছিয়ে নে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরুব।"

কাকাবাবু এক-এক সময় খুব কম কথা বলেন। তখন তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করারও নিয়ম নেই। সন্তু চুপচাপ সব কথা শুনে যায় শুধু।

কাঠমাণ্ডুর হোটেল থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট আসা হল। সন্তু ভাবল, আবার বুঝি কলকাতায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এবার উঠল ওরা একটা ছোট প্লেনে। মাত্র দশ-বারোজন যাত্রী। কিছুক্ষণ ওড়ার পরই সন্তু দেখতে পেল সব বরফের মুকুট পরা পাহাড়ের চূড়া।

প্লেনটা এসে নামল একটা খুব ছোট্ট জায়গায়। এরকম জায়গায় যে প্লেন নামতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। জায়গাটার নাম সিয়াংবোচি। সেখান থেকে দু'জন মাত্র মালবাহক সঙ্গে নিয়ে শুরু হল হাঁটা। সন্তুর তখনও সব ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছিল। দু'জন মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে এভারেস্টে ওঠা হবে? তাঁবু কোথায়? অন্য সব জিনিসপত্র কোথায়? পাহাড়ি রাস্তায় ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবুকে হাঁটতে দেখে অন্যান্য যাত্রীরা অবাক হয়ে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। এরকম কোনও লোককে এত উঁচু পাহাড়ের রাস্তায় কেউ কোনওদিন দেখেনি। এ রাস্তায় অনেক বিদেশি দেখা যায়। সাহেব তো আছেই, কিছু কিছু মেমও কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে। সিয়াংবোচিতে জাপানিরা একটা মস্ত বড় হোটেল বানিয়েছে।

কাকাবাবু কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ক্রাচ ঠুকে-ঠুকে ঠিক উঠে যান পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। সন্তু হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু কাকাবাবুর যেন দৈত্যের শরীর।

এইরকম একটি পাহাড়ি রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন পঙ্গু হয়ে গেছে। তবু পাহাড়কে ভয় পান না

কাকাবাবু।

ফুনটুংগা বলে একটা ছোট জায়গা পেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসে সন্তু আর কাকাবাবু কমলালেবু, পাঁউরুটি আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় কয়েকটি পাহাড়ি লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বলে গেল, "পালাও, পালাও, সাবধান, বুনো ভাল্লুক বেরিয়েছে।"

শুনেই সন্তু চমকে উঠেছিল। চারদিকে পাহাড় আর ফাঁকা রাস্তা, ওরা পালাবে কী করে? ফুনটুংগা ফিরে যেতে গেলে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া কাকাবাবু তো পালাতেও পারবেন না।

কাকাবাবু কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে পাইপ ধরিয়ে বললেন, "কমলালেবুর খোসা রাস্তার ওপর ফেলেছিস কেন? সব খোসা এক জায়গায় সরিয়ে একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে রেখে দে। পাহাড় কখনও নোংরা করতে নেই।"

রাস্তার এক পাশে জঙ্গল, এক পাশে খাদ, সেই খাদের নীচে দেখা যায় একটা রুপোর হারের মতন সরু নদী। সন্তু ভয়ে-ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল। সন্তুর মনে হল, হঠাৎ সেখান থেকে একটা ভাল্লুক এক লাফে বেরিয়ে আসবে।

এর পরে দু'জন সাহেবও ছুটতে-ছুটতে নেমে এল ওপরের রাস্তা দিয়ে। তারাও কাকাবাবুকে দেখে ইংরেজিতে বলল, "তোমরা এখানে বসে আছ কেন? নীচে নেমে যাও। এদিকে একটা বুনো ভাল্লুক দেখা গেছে।"

কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না।

একটু বাদে আবার শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। সন্তু এবার ভাবল, নিশ্চয়ই ভাল্লুকটা ওদের তাড়া করে আসছে।

লোকগুলো কাঁধে করে বয়ে আনছে একজন আহত মানুষকে।

তার গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। লোকটি সেই অবস্থাতেও জ্ঞান হারায়নি, 'আঁ আঁ আঁ' শব্দ করছে।

কাকাবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, সেই লোকগুলো নিজেরাই চিৎকার করে অনেক কথাই বলল, যাতে বোঝা গেল যে, বনের মধ্যে এই লোকটিকে ভাল্লুকে আক্রমণ করে ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে। লোকটিকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে।

ওরা চলে যাবার পর সন্তু দেখল, রাস্তায় পড়ে আছে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত। মানুষের রক্ত!

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ি ভাল্লুকরা খুব হিংস্র হয়! এক হিসেবে বাঘ-সিংহের চেয়েও হিংস্র, এরা অকারণে মানুষ মারে।"

কোটের ভেতরের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর ভয় করছে?"

সন্তু কী উত্তর দেবে? চোখের সামনেই তো সে দেখল যে, ভাল্লুকে একটা লোকের পেট ফালাফালা করে দিয়েছে। হঠাৎ যদি ভাল্লুকটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? রিভলবার দিয়ে কি ভাল্লুক মারা যায়? সন্তু সব শিকারের গল্পে পড়েছে যে, শিকারীদের হাতে থাকে রাইফেল।

গলা শুকিয়ে এসেছে, তবু সেই শুকনো গলাতেই সন্তু উত্তর দিয়েছিল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এই পাথরটার আড়ালে গিয়ে বোস্। আমাদের এই রাস্তা দিয়েই উঠতে হবে, বেশিক্ষণ তো সময় নষ্ট করলে চলবে না!"

সন্তু এবার একটু সাহস করে বলল, "কাকাবাবু, সবাই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমরাও নীচের গ্রামটায় ফিরে গিয়ে আজকে থেকে গেলে পারি না? এমন-কী, সাহেবরাও নেমে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "এমন-কী সাহেবরাও মানে? সাহেবরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সাহসী নাকি?"

সন্তু একটু থতমত খেয়ে বলল, "না। মানে, ইয়ে—"

কাকাবাবু একটুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "কোথাও যাবার জন্য বেরিয়ে আমি কখনও পেছনে ফিরে যাই না। আমার সঙ্গে যেতে হলে এই কথাটা তোকে সব সময় মনে রাখতে হবে।"

তারপর, সন্তুকে দারুণভাবে চমকে দিয়ে কাকাবাবু রিভলবার উঁচিয়ে 'ডিসুম্' শব্দে গুলি করলেন।

গুলির আওয়াজে চার পাশের পাহাড়গুলো যেন কেঁপে উঠল। যেন অনেকগুলো গুলি ঠিকরে গেল অনেকগুলো পাথরে। তারপরেও দূরে-দূরে সেই আওয়াজ হতে লাগল।

কাকাবাবু এমন আচমকা গুলি ছুঁড়েছিলেন যে, সন্তু দারুণ চমকে উঠেছিল। পাহাড়ি জায়গায় প্রতিধ্বনি কেমন হয়, সে সম্পর্কেও সন্তুর প্রথম অভিজ্ঞতা হল।

কাকাবাবু রিভলবারটার ডগায় দুবার ফুঁ দিলেন। তারপর সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই রিভলবার চালানো শিখতে চাস?"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু রিভলবারটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "শক্ত করে ধর্! এখন বড় হয়েছিস, ঠিক পারবি। এবারে যে অভিযানে বেরিয়েছি, তাতে পদে-পদে বিপদ হতে পারে। ধর আমি যদি

হঠাৎ মরে যাই, তোকে তো বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।"

সন্তু রিভলবারটা ধরে হাতটা বুকের কাছে রেখেছিল। সিনেমায় সে লোকদের ওইভাবে গুলি চালাতে দেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, "ওভাবে না। ওভাবে গুলি চালালে তুই নিজেই মরবি! হাতটা সোজা করে সামনে বাড়িয়ে দে। হাতটা খুব শক্ত করে রাখ, কনুইটা যেন কিছুতেই বেঁকে না যায়। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই খুব জোরে ঝাঁকুনি লাগে কিন্তু!"

সত্যিকারের রিভলবার হাতে নিলেই একটা রোমাঞ্চ হয়। সন্তু এর আগে দু-একবার কাকাবাবুর রিভলবারটা ছুঁয়ে দেখেছে। একবার, আনতাবড়ি গুলি চালিয়েওছিল। এবার সে টিপ করে ঠিকঠাক গুলি ছুঁড়বে।

কাকাবাবু বললেন, "মনে কর, এই সময়ে যদি হঠাৎ ভাল্লুকটা এসে পড়ে, তুই মারতে পারবি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু বললেন, "অত সোজা নয়। আচ্ছা, ওই যে পাইনগাছটা, ওর মাথায় টিপ করে লাগা তো! সাবধান, কনুই যেন বেঁকে না যায়।"

সন্তু কায়দা করে এক চোখ টিপে খুব ভাল করে দেখে নিল পাইন গাছের মাথাটা, তারপর ট্রিগার টিপল।

এমন জোরে শব্দ হল যে সন্তুর কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। ও চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। তারপর চোখ খুলে দেখল, কাকাবাবু হাসছেন।

কাকাবাবু বললেন, "বেচারা গাছটা খুব বেঁচে গেছে! তোর গুলিতে তার একটা পাতাও খসে পড়েনি।"

সন্তু ভেবেছিল তার গুলিটা ঠিকই লাগবে। এই তো রিভলবারের নলটা ঠিক গাছটার দিকে মুখ করা। তবু গুলিটা

বেঁকে গেল?

লজ্জা লুকোবার জন্য সেও কাকাবাবুর মতন কায়দা করে রিভলবারের নলে ফুঁ দিল দু'বার।

কাকাবাবু আবার বললেন, "অত সোজা নয়। আরও অনেকবার প্র্যাকটিস করতে হবে।"

মালবাহক কুলি দুজন নীচের নদীটায় নেমে গিয়েছিল জল খাবার জন্য। পর-পর দু'বার গুলির শব্দ শুনে তারা হন্তদন্ত হয়ে তরতর করে উঠে এল পাহাড় বেয়ে। সন্তুর হাতে রিভলবার দেখে ওরা অবাক।

এদের একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া হুয়া, সাব?"

কাকাবাবু বললেন, "এদিকে একটা ভাল্লুক বেরিয়েছে।"

এই পাহাড়িরাও ভাল্লুককে ভয় পায়। ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। এই সময় তিনজন জাপানি নেমে এল ওপরের পথ দিয়ে।

কাকাবাবু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ভাল্লুক সম্পর্কে কিছু শুনেছ?"

জাপানিরা ভাল ইংরেজি বোঝে না। কথাটা দু-তিনবার বলে বোঝাতে হল তাদের। তারপর তারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানাল যে, অনেক লোকজন বনের মধ্যে তাড়া করে গেছে, ভাল্লুকটা পালিয়েছে।

একজন জাপানি হেসে বলল, "আমরা খুব আনলাকি! আমরা ভাল্লুকটা দেখতে পেলাম না।"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "দেখলি! একে বলে সাহসী লোক। দিনের বেলা রাস্তা দিয়ে এত লোক যাওয়া-আসা করছে, একটা ভাল্লুক কী করবে?"

সন্তু বলল, "কিন্তু ভাল্লুকটা যে একটা লোকের পেট চিরে দিয়েছে দেখলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "সে নিশ্চয়ই একটা বোকা লোক। চল্, আমরা এবার উঠে পড়ি। ভাল্লুকটা যদি এদিকে এসেও থাকত, গুলির আওয়াজ শুনেই পালিয়েছে। ভাল্লুকেরও তো প্রাণের ভয় আছে !"

মালবাহকদের তিনি বললেন, "ভাল্লুক ভেগে গেছে। মাল উঠাও !"

তারা তবু দাঁড়িয়ে গা মোচড়াতে লাগল।

এইসময় কপকপ কপাকপ শব্দ হল নীচের দিকে। সন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখল, দুজন লোক ঘোড়ায় চেপে খুব জোরে এদিকে আসছে। তাদের চেহারা আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, তারা পুলিশ।

কাছে এসে তারা জিজ্ঞেস করল, "এদিকে কোথায় গুলির শব্দ হল, তোমরা শুনেছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আমি আমার ভাইপোকে শুটিং প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম।"

লোক দুটি তড়াক করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বলল, "তোমরা গুলি ছুঁড়ছিলে ? এখানে শিকার করা নিষেধ, তোমরা জানো না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তো শিকার করিনি। তাছাড়া, একটা ভাল্লুক যদি সামনে এসে পড়ে, তার দিকে গুলি ছোঁড়াও কি নিষেধ নাকি ?"

একজন লোক সন্তুর হাত চেপে ধরল। অন্য লোকটি রুক্ষ গলায় কাকাবাবুকে বলল, "তোমরা বে-আইনি কাজ করেছ, থানায় চলো !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "থানা কোথায় ?"

লোকটা হাত তুলে দেখাল সিয়াংবোচির দিকে। সিয়াংবোচি খুব বড় জায়গা, হোটেল আছে, সেখানেই থানা থাকা স্বাভাবিক।

কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, "যে পথ দিয়ে একবার এসেছি, সেদিকে ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। ওকে ছেড়ে দাও ! ফাঁকা জায়গায় শুটিং প্র্যাকটিস করা কোনও বে-আইনি ব্যাপার হতে পারে না।"

পুলিশটি ধমক দিয়ে বলল, "চলো, ওসব কথা থানায় গিয়ে বলবে চলো !"

কাকাবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "আমার গায়ে হাত দিও না !"

তারপর কোটের ভেতর-পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বার করে বললেন, "পড়তে জানো, এটা পড়ে দ্যাখো ! সিয়াংবোচি থানার অফিসার আমার নাম জানে।"

কাগজটা পড়তে-পড়তে পুলিশটির ভুরু উঁচু হয়ে গেল। সে তার সঙ্গীকেও দেখাল কাগজটা। তারপর দুজনে এক সঙ্গে ঠকাস করে জুতো ঠুকে সেলাম দিল কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু ডান হাতটা একটু উঁচু করলেন শুধু।

পুলিশ দুজন অবাক হয়ে কাকাবাবুর চেহারা আর খোঁড়া পা'টা দেখল। তারপর একজন বলল, "স্যার, আমরা দুঃখিত। আগে বুঝতে পারিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা কোনও বে-আইনি কাজ করিনি তবু তোমরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে চাইছিলে।"

সেই পুলিশটি বলল, "মাপ করবেন, স্যার। আমরা সত্যি বুঝতে পারিনি !"

অন্য পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি কি সত্যি

এভারেস্টে যেতে চান?"

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "দেখা যাক্!"

সে আবার বলল, "স্যার, আপনাকে আমরা কোনও সাহায্য করতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু না! শুধু এই মালবাহক দুজনকে বলে দাও, যেন ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে কখনও আপত্তি না করে।"

পুলিশ দুজন আরও অনেকবার সেলাম-টেলাম করে বিদায় নেবার পর সন্তুরা আবার চলা শুরু করল।

সন্তুর মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা ছটফট করছিল, মালবাহক দুজনেই তা জিজ্ঞেস করল কাকাবাবুকে। পুলিশরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, তারপর একটা কাগজ দেখেই এত সেলাম ঠুকতে লাগল দেখে ওরা অভিভূত। এসব জায়গায় পুলিশদের প্রায় দেবতার সমান ক্ষমতা। সেই পুলিশরা এই বাঙালিবাবুকে এত খাতির করল!

তারা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সাব্, ওই কাগজটাতে কী লেখা আছে?"

কাকাবাবু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ওটা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। তিনি নেপালের অতিথি। একটা বিশেষ গোপনীয় আর জরুরি কাজে তিনি যাচ্ছেন এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে লিখে দিয়েছেন যে, সব জায়গার পুলিশ যেন কাকাবাবুকে সব রকমে সাহায্য করে!

একথা শুনে মালবাহক দুজনও সেলাম দিয়ে ফেলল কাকাবাবুকে। একজন আর-একজনকে বলল, "দেখলি, লেখাপড়া শেখার কত দাম! এই বাঙালিবাবু লেখাপড়া শিখেছেন বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এঁকে খাতির করেন। ইশ, আমরা

কেন দুটো-চারটে বই পড়তে শিখিনি!" অন্যজন বলল, "আমাদের মহল্লায় একটা ইস্কুল খুলেছে, আমার ভাইকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছি।"

এর পর আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। মাঝখানে একটা বড় জায়গায় বিশ্রাম নেওয়া হয়েছিল তিনদিন। এই জায়গাটার নাম থিয়াংবোচি। এর আগে যে বড় জায়গাটায় জাপানি হোটেল আছে, সে জায়গাটার নাম সিয়াংবোচি। দুটো নাম প্রায় একই রকম, সন্তুর গুলিয়ে যায়। তবে থিয়াংবোচি জায়গাটা যেন অনেক বেশি সুন্দর। বেশ একটা পবিত্র ভাব আছে। এভারেস্টের পায়ের কাছে এই শেষ শহর। এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাঁবু, পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম আর খাবার-দাবার সেখান থেকেই কিনে নিলেন কাকাবাবু। দুজন শেরপা আর পাঁচজন মালবাহককেও ঠিক করা হল। তবে এত ছোট দল নিয়ে কাকাবাবু এভারেস্টের দিকে যেতে চান শুনে সবাই অবাক। সেখানকার লোক অনেক এভারেস্ট-অভিযাত্রী দেখেছে, কিন্তু একজন খোঁড়া প্রৌঢ় লোক আর একজন কিশোর এভারেস্টে উঠতে চায় শুনে অনেকে হেসেই আকুল। একজন ডাক্তার তো কাকাবাবুকে অনেকবার বারণ করলেন।

কিন্তু কাকাবাবু যে কী-রকম গোঁয়ার, তা তো ওরা জানে না।

সেখানে একটা চমৎকার মনাস্টারি আছে। খুব শান্ত আর নিরিবিলি জায়গাটা। সকালবেলা সেই মনাস্টারির দিকে যেতে যেতে সন্তু দেখেছিল, সামনে তিনদিকে তিনটি সাদা পাহাড়ের চূড়া। তার মধ্যে একটি এভারেস্ট! সেই প্রথম সন্তু এভারেস্ট দেখল, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, তারপরই কুয়াশায় সব-কিছু মিলিয়ে গিয়েছিল।

থিয়াংবোচিতে ওরা ছিল গভর্নমেন্টের গেস্ট হাউসে।

কয়েকজন সাহেব-মেমও সেখানকার অতিথি। তারা সন্তুর সঙ্গে আলাপ করে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমরা এভারেস্টের দিকে যাচ্ছ কেন ? এ তো পাগলামি !'

সন্তু উত্তর দিতে পারেনি। কাকাবাবু যে তাকে বিশেষ কিছুই জানাননি। কাকাবাবুর কাছে কাচের বাক্সে যে জিনিসটা আছে, সেটা তিনি সব সময় খুব সাবধানে রাখেন। সেটা সম্পর্কে শুধু সন্তুকে বলে রেখেছেন, এটার কথা কখনও কারুকে বলবি না !

সেখানে একদিন সন্ধেবেলা কাকাবাবু বাইরে থেকে ফিরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, আমার দাঁতটা কোথায় গেল ?"

আমার দাঁত মানে কাকাবাবুর নিজের দাঁত নয়। কাচের বাক্সর সেই জিনিসটা। সেটা কাকাবাবু নিজেই সব সময় সাবধানে রাখেন।

সন্তু বলল, "আমি তো জানি না।"

কাকাবাবু দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন সব-কিছু উল্টেপাল্টে। একটু বাদেই সেটা পাওয়া গেল অবশ্য। অতি সাবধান হতে গিয়ে কাকাবাবু নিজেই কখন সেটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন।

সেটাকে পাবার পর কাকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "বাবাঃ ! এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি না থাকলে তুই কক্ষনো ঘরের বাইরে যাবি না ! সব সময় এটাকে চোখে চোখে রাখবি ! এটার কত দাম জানিস !"

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, ওটা কী ?"

কাকাবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "এখন তোর জানবার দরকার নেই। সময় হলে বলব !"

তারপর সেখান থেকে শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে চলে আসা হয়েছে এই গোরখশেপে। এখানে অন্য অভিযাত্রীরা বেস ক্যাম্প

করে। কাকাবাবু কিন্তু এখান থেকে আর এগোতে চাইছেন না। তাঁবু ফেলা হয়েছে, এখানে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

এখানে আর সন্তুর সময় কাটতে চায় না। সব সময় বরফ দেখতে-দেখতে যেন চোখ পচে যায়। একটা টিবির ওপর চড়ে সন্তু অনেকবার দেখেছে মাউন্ট এভারেস্ট। ওখানে কি সত্যিই যাওয়া যাবে ?

শেরপা সর্দার মিংমার সঙ্গে দিনের বেলা সে মাঝে মাঝে খানিকটা দূর পর্যন্ত যায়। মিংমার গায়ে দারুণ জোর আর খুব চটপটে। এর আগে সে দুবার দুটি সাহেবদের দলের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই সাহেবরা তাকে একেবারে চূড়ায় উঠতে দেয়নি। এজন্য তার মনে খুব দুঃখ।

মিংমার ইচ্ছে সেও এভারেস্টের চূড়ায় উঠে তেনজিংয়ের মতন বিখ্যাত হবে, তারপর সে বিলেত আমেরিকায় নেমন্তন্ন খেতে যাবে। সাহেবদের সঙ্গে মিশে মিশে সে ইংরেজি কথা অনেক শিখে নিয়েছে। সাহেবদের দেওয়া পোশাক পরে তাকে খুব স্মার্ট দেখায়।

মিংমা সন্তুকে বলে, "শোনো সন্তু সাব, তোমার আংকল কিছুতেই এভারেস্ট যেতে পারবে না ! এক পা নিয়ে কেউ পাহাড়ে ওঠে ? এ এক আজব বাত !"

সন্তু বলে, "তুমি আমার কাকাবাবুকে চেনো না ! মনের জোরে উনি সব পারেন।"

মিংমা বলে, "আরে রেখে দাও মনের জোর। পাহাড়ে উঠতে তাগত লাগে ! আরও কত দূর যেতে হবে, তা তোমরা জানো না ! তুমি এক কাজ করো, তোমার আংকলকে বুঝিয়ে বলো, তিনি এখানে থাকুন। তোমাকে নিয়ে আমরা কয়েকজন এগিয়ে যাই।

দেখো, তুমি আর আমি ঠিক একদম সাউথ কল্ ধরে চূড়ায় উঠে যাব।"

সন্তু জানে, এসব কথা আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। কাকাবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।

দিনের বেলা যদিও কেটে যায় কোনওক্রমে, রাত আর কাটতেই চায় না। শীতের জ্বালায় সন্তু সন্ধে হতে না হতেই শুয়ে পড়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। তারপর ঘুম আসে না আর।

কাকাবাবু গম্বুজের মাথার কাছে বসে থাকেন, হাতে দূরবিন নিয়ে। ওখানে বসে তিনি কী দেখতে চান, কে জানে! ওখান থেকে তো এভারেস্টও দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্তুর মাথার কাছে আলোটা জ্বলে। কাকাবাবু না নেমে এলে ওই আলো নেভানো যাবে না। টেবিলের ওপর কাচের বাক্সে রাখা সেই দাঁতের মতন জিনিসটা। ওটা নিশ্চয়ই দাঁত নয়, কোনও দামি পাথর। সন্তু ওটার দিকে তাকাতে চায় না, তবু ওদিকে চোখ চলে যাবেই। এর মধ্যে সন্তু একদিন ওটা নিয়ে স্বপ্নও দেখেছিল। ও জিনিসটা যেন আরও বড় হয়ে একটা কোদালের মতো কোপ লাগাচ্ছে সন্তুর গায়ে!

"সন্তু! সন্তু!"

সন্তুর একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে উঠে বসা যায় না। কে ডাকল তাকে? সন্তুর মনে হল গম্বুজের বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকছে তাকে।

আরও দু'বার ফিসফিসে গলায় ওরকম ডাক শুনে সন্তু বুঝতে পারল, গম্বুজের ওপর থেকে কাকাবাবুই ডাকছেন তাকে।

"কী?"

"শিগগির ওপরে উঠে আয়, এক্ষুনি!"

কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্য থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরনো যায় না। সন্তু পড়পড় করে চেনটা টেনে খুলে বেরিয়ে এল। বাইরে আসা মাত্র শীতে কেঁপে উঠল ঠকঠকিয়ে। বিছানার পাশেই রাখা থাকে তার ওভারকোট, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু দূরবিনটা সন্তুর হাতে দিয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "দ্যাখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছিস? দূরে কিছু নড়ছে?"

সন্তু চোখে দূরবিন লাগিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু আবছা আবছা অন্ধকার।

এখানকার আকাশ প্রায় কখনওই পরিষ্কার থাকে না। সব সময় মেঘলা-মেঘলা, তবু তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে চাঁদের আলো এসে পড়ে।

সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কই, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। দু' জায়গায় বরফে জ্যোৎস্না ঠিক্‌রে ঝকঝক করছে। আর কিছু দূরে কালাপাথর নামে সেই ছোট পাহাড়টা। সেটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে পেয়েছিস?"

"না তো!"

"একদম সোজা নয়, একটু ডান দিকে।"

সন্তু ডান দিক বাঁ দিক সব দিকেই দূরবিনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। কোথাও কিছু নেই। কাকাবাবু কী দেখার কথা বলছেন ? এই বরফের দেশে একটা পাখি পর্যন্ত নেই !

"এখনও দেখতে পাসনি ?"

"না, কাকাবাবু !"

কাকাবাবু এবার সন্তুর কাছ থেকে দূরবিনটা নিয়ে নিজের চোখে লাগালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "সত্যিই তো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না ! অথচ একটু আগে স্পষ্ট দেখলাম যেন ! তাহলে কি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার জন্য আমার চোখের ভুল হল !"

"কাকাবাবু, ওখানে কী থাকতে পারে ?"

"সেটা ভাল করে না দেখলে বুঝব কী করে ?"

আরও কিছুক্ষণ চোখে দূরবিন এঁটে বসে রইলেন কাকাবাবু। তারপর এক সময় হতাশভাবে বললেন, "নাঃ, আজ আর কিছু দেখা যাবে না ! চল, এবার শুয়ে পড়ি !"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সন্তু তাড়াতাড়ি কোট-ফোট খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেল। কাকাবাবু নামলেন ধীরে-সুস্থে, কিন্তু তক্ষুনি শুয়ে পড়লেন না। একটা কালো রঙের খাতার পাতা উল্টে-উল্টে কী যেন দেখতে লাগলেন।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবুর কি শীতও করে না ? খানিকক্ষণ স্লিপিং ব্যাগের বাইরে থেকেই তো সন্তুর কাঁপুনি ধরে গেছে।

বিলিতি আলোটা এমন উজ্জ্বল যে, চোখে লাগে। ওটাকে আবার কমানো বাড়ানো যায়। আলোটা খানিকটা কমে যেতেই সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু এবার শুয়ে পড়েছেন।

কাকাবাবু একটা শব্দ করলেন, "আঃ !"

এই "আঃ" শুনেই বোঝা যায়, আজকের মতন কাকাবাবুর সব

কাজ শেষ। এই শব্দটা করার ঠিক আধঘণ্টা বাদে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েন।

একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য সন্তুর আর সহজে ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে এপাশ-ওপাশ ফিরে ছটফট করা যায়। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সহজে পাশ ফেরার উপায় নেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা কি সত্যিই এভারেস্টের দিকে যাব ?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দরকার হলে যেতে হবে নিশ্চয়ই !"

সন্তু ভাবল, দরকার আবার কী ? দরকারের জন্য কেউ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে যায় নাকি ? কাকাবাবুর অনেক কথারই মানে বোঝা যায় না।

"আমরা এভারেস্টে উঠতে পারব, কাকাবাবু ?"

"কেন পারব না ? ইচ্ছে থাকলেই পারা যায়।"

কাকাবাবু খোঁড়া এবং কোনও খোঁড়া লোক অত উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারে, এই কথাটা সব সময় সন্তুর মাথার মধ্যে ঘোরে। কিন্তু একথাটা তো কাকাবাবুকে মুখ ফুটে বলা যায় না। কাকাবাবুর ধারণা, তীব্র ইচ্ছে আর মনের জোর থাকলে মানুষ সব কাজই পারে।

ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় কাকাবাবু চলাফেরা করতে পারেন ঠিকই। কাশ্মীরে ঘুরেছেন, এখানেও তো সিয়াংবোচি থেকে এতটা পাহাড়ি চড়াই-উতরাই হেঁটে এসেছেন। দু'একবার অবশ্য পা পিছলে পড়েছেন, তাতে কিন্তু একটুও দমেননি।

কিন্তু এভারেস্টে ওঠা তো অন্য ব্যাপার। সন্তু ছবিতে দেখেছে যে, এভারেস্ট-অভিযাত্রীরা কোমরে দড়ি বেঁধে আর হাতে লোহার

গাঁইতির মতন একটা জিনিস নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে বেয়ে ওঠে, অনেকটা টিকটিকির মতন।

কাকাবাবু কি সেরকম পারবেন? যতই মনের জোর থাক, কোনও খোঁড়া মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব! শুধু মনের জোর নয়, কাকাবাবুর গায়েও খুব জোর আছে, কিন্তু তাঁর একটা পা যে অকেজো। একটা দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর ওই পা-টা নষ্ট হয়ে গেছে।

সন্তুর আর একটা কথাও মনে পড়ল। কলকাতায় তাদের বাড়িতে তেনজিং নোরগে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গোপনে কী সব কথাবার্তার পর বিদায় নেবার সময় তেনজিং কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, "গুড লাক। আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি পারবেন···।" একথা সন্তু নিজের কানে শুনেছে। কাকাবাবুকে খোঁড়া দেখেও তেনজিং কেন বলেছিলেন, আপনি পারবেন? এভারেস্টে ওঠা কি এতই সহজ?

এই সব ভাবতে ভাবতে সন্তু যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে টেরই পায়নি।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, কাকাবাবু আগেই উঠে পড়েছেন। ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবুর পড়াশুনো করার অভ্যেস। তা তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন। আজও তিনি পড়তে শুরু করেছেন সেই কালো রঙের খাতাটা খুলে। কিছু-কিছু লিখছেনও মাঝে-মাঝে।

গম্বুজের লোহার দরজাটায় দুম্‌দুম্‌ করে শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু উঠেছিস? দরজাটা খুলে দে তো!"

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে তারপর সন্তু দরজাটা খুলল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মিংমা। তার হাতে একটা ফ্লাস্ক। সে ভিতরে ঢুকে পড়ে বলল, "দরজাটা বন্ধ কর দেও, সন্তু সাব!"

সন্তু দরজা বন্ধ করে দেবার আগেই কয়েক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এতগুলো গরম জামা ভেদ করেও তাতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে যায়।

মিংমা দুটো প্লাস্টিকের গেলাসে চা ঢালল ফ্লাস্ক থেকে। ওই গেলাসগুলো খুব গরম হয়ে যায়। কলকাতায় বসে ওই রকম গেলাসে চা খাওয়ার খুব অসুবিধে, কিন্তু এখানে ওই গরম গেলাস দু' হাতে চেপে ধরেও খুব আরাম।

কাকাবাবু বললেন, "তুমিও এক গেলাস চা নাও, মিংমা! তারপর বলো, আজ হাওয়া কী রকম?"

উবু হয়ে বসে মিংমা বলল, "আজ হাওয়া বহুত কম হ্যায়, সাব! স্কাই বিলকুল ক্লিয়ার! ওয়েদার ফারস্ট্ কিলাস!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ!"

মিংমা উৎসাহ পেয়ে বলল, "সাব, আজ তাঁবু গুটাব? আজ সামনে যাওয়া হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! আরও কয়েকটা দিন থাকতে হবে এখানে!"

মিংমা আর সন্তু দু'জনেই তাকাল দু'জনের চোখের দিকে। দু'জনের মনেই এক প্রশ্ন, এখানে থাকতে হবে কেন?

কাকাবাবু বললেন, "আর একটু চা দাও, আছে?"

বেলা বাড়ার পর যখন রোদ উঠল, তখন সন্তু বেরিয়ে এল গম্বুজের বাইরে। মিংমা ছাড়া যে আর একজন শেরপা আছে, তার নাম নোরবু। সে একটু গম্ভীর ধরনের, মিংমার মতন অত হাসিখুশি নয়। তবে সে বেশ ভাল পুতুল বানাতে পারে। এখানে তো কয়েকদিন ধরে কোনও কাজ নেই, সে তাঁবুর বাইরে বসে ছুরি

দিয়ে কাঠের টুকরো কেটে কেটে নানান রকম পুতুল বানায়। সন্তকে সে একটা ভাল্লুক-পুতুল উপহার দিয়েছে।

মালবাহকরা সকাল থেকেই রান্নাবান্নায় মেতে যায়। আর তো কোনও কাজ নেই, সারাদিন ধরে খাওয়াটাই একমাত্র কাজ। মালবাহকরা রান্না করছে আর কাছেই বসে নোরবু একটা পুতুল বানাচ্ছে।

সন্ত তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। পুতুলটা প্রায় তৈরি

হয়ে এসেছে। কিন্তু এটা কিসের পুতুল ? কী-রকম যেন অদ্ভুত দেখতে। অনেকটা বাঁদরের মতন, কিন্তু পিঠটা বাঁকা আর হাত দুটো এত লম্বা যে, প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত।

সন্ত জিজ্ঞেস করল, "নোরবু-ভাই, এটা কী ?"

নোরবু মুখ না তুলে বলল, 'টিজুতি।"

সন্ত বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "টিজুতি ? সেটা আবার কী ?"

নোরবু বলল, "টিজুতি হ্যায় ! টিজুতি !"

গম্ভীর স্বভাবের নোরবুর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানা যাবে না।

সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খানিকটা দূরে মিংমা একা-একা দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। সে মাউথ অর্গান বাজিয়ে সময় কাটায়।

সে মিংমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিংমা-ভাই, টিজুতি মানে কী ?"

বাজনা থামিয়ে মিংমা হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেন, হঠাৎ টিজুতির কথা পুছছ কেন ?"

"নোরবু-ভাই একটা পুতুল বানাচ্ছে। বলল, সেটা টিজুতি !"

মিংমা বলল, "ছোট বাচ্চা, তোমার থেকেও থোড়াসা ছোটা, উসকো বোলতা টিজুতি। আর উসসে বড়া, এই হামারা মাফিক, তার নাম মিটি ! আউর বহুত বড়া, আমার থেকেও অনেক বড় তার নাম ইয়েটি !"

সন্তুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। ইয়েটি মানে কি ইয়েতি ? তা হলে কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে এখানে এসেছেন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! রেঞ্জ দূরবিন দিয়ে আর কী দেখবেন ? কাচের বাক্সের জিনিসটা তা হলে নিশ্চয়ই ইয়েতির দাঁত !

সন্তুর মনে পড়ল, অনেকদিন আগে সে 'টিনটিন ইন টিবেট' বলে একটা বই পড়েছিল। সে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার-বইগুলোর খুব ভক্ত। 'টিনটিন ইন টিবেট' বইটাতে টিনটিন ইয়েতির সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তিব্বতে।

তারপরই তার আবার মনে পড়ল, টিনটিন তো সেই গল্পে পাটনা থেকে নেপালে এসে তারপর তিব্বতের দিকে গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে, ঠিক এই জায়গাটাতেই এসেছিল

টিনটিন ?

সে উত্তেজিতভাবে মিংমার হাত চেপে ধরে বলল, "মিংমা-ভাই, তুমি ইয়েতি দেখেছ ?"

মিংমা দু' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "নাঃ !"

সন্তু একটু নিরাশ হয়ে বলল, "দেখোনি ? তা হলে জানলে কী করে যে ওরা তিনরকম হয় ? টিজুতি, মিটি আর ইয়েতি ?"

মিংমা বলল, "সব লোগ এইসা বোলতা !"

"তুমি না দেখলেও আর কেউ দেখেনি ? আর কোনও শেরপা কিংবা তোমাদের গাঁয়ের কোনও লোক ?"

"না, সন্তু সাব ! কেউ দেখেনি। দু-একঠো আদমি ঝুঠ বলে। লেকিন কোনও শেরপা দেখেনি। আমার বাবার এক বহুত বুঢ্‌ঢা চাচা ছিল,, সেই নাকি দেখেছিল, কিন্তু সে-চাচা বহুদিন হল মরে গেছে।"

"নোরবু-ভাইও দেখেনি ? তা হলে ও টিজুতির পুতুল বানাচ্ছে কী করে ?"

মিংমা হা-হা করে হেসে উঠল। সন্তু বিরক্ত হল একটু। এতে হাসির কী আছে— কোনও জিনিস না দেখলে কেউ তার পুতুল বানাতে পারে ?

মিংমা বলল, "বহুত লোক আগে টিজুতিকা পুতুল বানিয়েছে, নোরবুও সেই দেখে বানাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "আগে যারা বানিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ দেখেছে নিশ্চয়ই ! কেউ না দেখলে এমনি-এমনি মন থেকে কেউ ওরকম অদ্ভুত মূর্তি বানায় ?"

মিংমা বলল, "সন্তু সাব, কিতনা আদমি তো কার্তিক, গণেশ, লছমী মাইজির মূর্তি বানায়, তারা কি সেই সব দেবদেবীদের আঁখসে দেখেছে ! গণেশজীর যে হাত্তির মতন মাথা, ওইসা মাফিক

কই কভি দেখা !"

কথাগুলো সন্তুর ঠিক পছন্দ হল না। আগেকার দিনে ঠাকুর-দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসতেন! তখন নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছে। তখন তারা মূর্তি গড়েছে, তাই দেখে-দেখে এখনকার লোকরা বানাচ্ছে।

কাকাবাবু যদি ইয়েতি আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে। পৃথিবীতে এর আগে কেউ জ্যান্ত বা মরা কোনও ইয়েতির ছবি তুলতে পারেনি। সন্তুর কাছে ক্যামেরা আছে, সন্তু যদি কোনওক্রমে একটা ইয়েতির ছবি তুলতে পারে!

সন্তু মিংমাকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে তিব্বত কত দূরে বলতে পারো? এদিক দিয়ে তিব্বত যাওয়া যায়?"

মিংমা বলল, "হাঁ, কেন যাওয়া যাবে না? তুমলোক যিস রাস্তাসে আয়া, সেদিকে নামচেবাজার আছে জানো? টাউন-মতন জায়গা!"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জানি। নামচেবাজার তো সিয়াংবোচির আগে।"

"ওহি নামচেবাজারসে যদি বাঁয়া দিকে যাও, তারপর থামিচক বলে এক গাঁও পড়বে। সেই গাঁও পার হয়ে যাও, উসকো বাদ বড়া-বড়া সব পাহাড়, সবসে বড়া পাহাড় কাংটেগা। কেন কাংটেগা নাম জানো? কাংটেগা মানে হল সফেদ ঘোড়া। ঠিক সাদা ঘোড়ার মতন দেখায় সে পাহাড়। ওহি দিকে আছে নাংপা পাস্। সেই নাংপা পাস্ দিয়ে চলে যাও, বাস, টিবেট পঁহুছে যাবে!"

সন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠল। তা হলে তো টিনটিনের গল্পের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। নেপালের মধ্য দিয়েই তো টিনটিন আর ক্যাপটেন হ্যাডক গিয়েছিল তিব্বতে।

মিংমাকে আর কিছু না-বলে সন্তু ছুট দিল গম্বুজের দিকে। একটুখানি যেতে-না-যেতেই ধড়াস করে আছাড় খেল।

মিংমা এসে তার হাত ধরে তুলে একটু বকুনি দিয়ে বলল, "সন্তু সাব, কিতনা বার বোলা, বরফের ওপর দিয়ে একদম ছুটবে না! কভি নেহি! আইস্তে-আইস্তে চলতে হয়!"

সন্তু একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। তবে একটা সুবিধে, এই বরফের ওপর জোরে আছাড় খেলেও গায়ে বেশি লাগে না।

কিন্তু সন্তু উৎসাহের চোটে আর স্থির থাকতে পারছে না। সাবধানে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গম্বুজটার দিকে চলল।

কাকাবাবু পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে তখন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছেন। সন্তু ভেতরে ঢুকে দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, এবার আমরা ইয়েতির খোঁজে এসেছি, তাই না?"

কাকাবাবু সন্তুর মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মুচকি হেসে শান্ত গলায় বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি?"

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ইয়েতি বলে কিছু নেই? কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে আসেননি?

আঙুল তুলে সে কাচের বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বলল, "তা হলে দাঁতের মতন ওটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই দাঁতটা সম্পর্কে তোর খুব কৌতূহল আছে, তাই না? আচ্ছা, আমি ঘুরে আসি একটু। ফিরে এসে তোকে ওই দাঁতটার ইতিহাস শোনাব!"

দুপুর থেকেই বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখানে বৃষ্টি মানেই বরফবৃষ্টি, তবে এক-এক সময় খুব নরম, পাতলা পেঁজা-তুলোর মতন তুষারপাত হয়, তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগে, তাতে গা ভেজে না। আর এক-এক সময় তুষারপাতে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, চার-পাঁচ হাত দূরের কোনও জিনিসও দেখা যায় না। সেই রকম বৃষ্টির মধ্যে হাঁটাচলা করাও অসম্ভব।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর থেকেই সন্তু গম্বুজের মধ্যে শুয়ে আছে। দিনের বেলাতেও এই গম্বুজের মধ্যে আলো খুব কম ঢোকে, তাই ব্যাটারি-লণ্ঠনটা জ্বেলে রাখতে হয়। সেই আলোতে কাকাবাবু তাঁর কালো রঙের খাতাটিতে খসখস করে কী সব লিখে চলেছেন।

মাঝখানে কাঠের বাক্সের ছোট টেবিলটিতে রাখা সেই চৌকো কাচের বাক্সটি, তার মধ্যে ভেলভেটের ওপর সাজানো সেই দাঁতের মতন জিনিসটা। সেটা দাঁত হতে পারে না। মানুষের দাঁতের মতনই আকৃতি, কিন্তু যে-কোনও মানুষের দাঁতের চেয়ে বোধহয় ছ' গুণ বড়। প্রায় দু' ইঞ্চি। মানুষ ছাড়া এরকম দাঁত অন্য কোনও প্রাণীর হয় না, আবার কোনও মানুষেরই এত বড় দাঁত হতে পারে না।

জুতোর দোকানের বাইরে এক-এক সময় একটা বিরাট ঢাউস জুতো সাজিয়ে রাখা হয়। মনে হয়, সেই জুতো কোনও মানুষের

জন্য নয়, দৈত্যদের জন্য তৈরি। সেই রকম এই দাঁতটাও নিশ্চয়ই কেউ মজা করে বানিয়েছে।

সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সন্তুর অনেক সময় মনে হয়, জিনিসটার যেন রং বদলায়। কখনও মনে হয়, সেটা বেশ হলদেটে, কখনও মনে হয় ফুটফুটে সাদা, আবার, এক-এক সময় একটু লালচে ভাবও আসে যেন। সত্যিই কি রং বদলায়, না ওটা সন্তুর চোখের ভুল?

কাকাবাবু লেখা থামিয়ে পাইপ ধরাতে যেতেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি দাঁতটার কথা বলবে বলেছিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "আর বুঝি কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিস না? ভেবেছিলাম, তোকে আরও কয়েকদিন পরে বলব! আচ্ছা শোন্ তা হলে!"

পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা দেখে তোর কী মনে হয়? এটা মানুষের দাঁত?"

সন্তু একবার বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "না!"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও, ঠিক তোরই মতন, কেউ বলেছেন, এটা মানুষের দাঁত। কেউ বলেছেন, তা হতেই পারে না! এটা নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। সে-সব কথা বলবার আগে, একজন লোকের কথা বলা দরকার। তাঁর নাম রাল্‌ফ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড। ইনি থাকতেন নেদারল্যান্ডসে, কিন্তু এঁর একটা শখ ছিল, যে-সব জীবজন্তু পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে গবেষণা করা। সেই জন্য তিনি পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষেও তিনি এসেছেন, চীনেও গেছেন। চীন দেশে, পিকিং শহরের রাস্তায়..."

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "এখন সেই শহরটার নাম বেইজিং!"

কাকাবাবু সন্তুর চোখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থেমে রইলেন। তাঁর কথার মাঝখানে তিনি অন্য কারুর কথা বলা পছন্দ করেন না।

সন্তু তা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন মুখ করল।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা বেশ, এখন নাম বেইজিং। যখনকার কথা বলছি, তখন ১৯৩০ সাল, সেই সময় সবাই পিকিং-ই বলত। সে সময় ওই পিকিং শহরের রাস্তায় একদল লোক নানারকম অদ্ভুত জিনিস বিক্রি করত। এরকম আমাদের দেশের রাস্তায়ও এখনও দেখা যায়। ফুটপাথে একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর নানা রকম জীবজন্তুর হাড়, কঙ্কাল, ধনেশ পাখির ঠোঁট, এই সব বিক্রি করে। রালফ্ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড পিকিংয়ের রাস্তায় এক ফেরিওয়ালার কাছে নানারকম হাড় ও পাখির পালকের সঙ্গে এই রকম তিনটি দাঁত দেখতে পেলেন। দেখে তো তিনি স্তম্ভিত! এত বড় মানুষের দাঁত? ফেরিওয়ালাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দাঁতগুলো কোথায় সে পেয়েছে? সে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। সে খালি বলে, পাহাড় থেকে! কোয়েনিংসওয়াল্ড খুব কম দামে দাঁত তিনটি কিনে নিলেন।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী?"

"ফেরিওয়ালারা ওই টুকরো-টুকরো হাড় আর কঙ্কাল বিক্রি করে কেন? ওগুলো কাদের কাজে লাগে? ডাক্তারি ছাত্রদের?"

"হ্যাঁ। ডাক্তারি ছাত্রদেরও কাজে লাগতে পারে। তা ছাড়া, অনেক লোকের ধারণা, সে সময় চীনাদের খুবই বিশ্বাস ছিল যে, এই সব জিনিস গুঁড়ো করে খেলে অনেক রোগ সেরে যায়। কেউ-কেউ আবার বিশ্বাস করত যে, পুরনো দিনের শক্তিশালী প্রাণীদের হাড় গুঁড়ো করে খেলে শরীরের তেজ বাড়ে। এখনও

যেমন অনেকের ধারণা, গণ্ডারের শিং খেলে শরীরে দারুণ তেজ হয়।"

"গণ্ডারের শিং মানুষে খায়?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই তো লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মারা হয়। গণ্ডার মারা এখন আইনে নিষেধ। তবু কিছু লোক লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মেরে তার শিংটা আরব শেখদের কাছে বিক্রি করে। এক-একটা শিং-এর দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার। আরবরা ওই শিং কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে ফেলে!"

"তারপর কোয়েনওয়াল্ড কী করলেন?"

"কোয়েনওয়াল্ড নয়, কোয়েনিংসওয়াল্ড। তিনি তারপর খোঁজ করে দেখলেন পিকিং, হংকং, জাভা, সুমাত্রা, বাটাভিয়ার অনেক ওষুধের দোকানেই এরকম দাঁত বিক্রি হয়। সেগুলোও বেশ বড় বড়, কিন্তু ওই তিনটির মতন অত বড় নয়। লোকের দাঁতের অসুখ হলে ওই দাঁত কিনে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজে, তাতেই সব অসুখ সেরে যায়। এত বড় বড় দাঁত কোন্ প্রাণীর, আর কোথায় এগুলো পাওয়া যায়, সেই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন কোয়েনিংসওয়াল্ড। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখলেন যে, ওই দাঁতগুলোর গোড়ায় একটু যেন হলদে হলদে ধুলো লেগে আছে। সেই ধুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, সেই রকম হলদে রঙের মাটি আছে ইয়াংসি নদীর ধারে পাহাড়ের কোনও-কোনও গুহায়। তখন তিনি ভাবলেন, ওই দাঁতওয়ালা প্রাণীরা নিশ্চয়ই তাহলে এক সময় ওই ইয়াংসি নদীর ধারের পাহাড়ের গুহাতেই থাকত। ওইগুলি যদি মানুষের দাঁত হয়, তাহলে সেই মানুষগুলো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ ফুট লম্বা হওয়া উচিত। কিন্তু অত বড় লম্বা মানুষের কথা কক্ষনো শোনা যায়নি, প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানুষের মতন কোনও প্রাণী অত লম্বা ছিল

না। যাই হোক, কোয়েনিংসওয়াল্ড সেই দাঁতওয়ালা কাল্পনিক প্রাণীদের নাম দিলেন জাইগ্যান্টোপিথিকাস। অর্থাৎ দৈত্যের মতন বন-মানুষ। পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিকই কিন্তু তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না।"

একটু থেমে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন।

তারপর আবার বললেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কোয়েনিংসওয়াল্ড জাভায় ছিলেন। তিনি বন্দী হলেন জাপানিদের হাতে। তাঁকে আটকে রাখা হল একটা ব্যারাকে, তাঁর জিনিসপত্র সব কেড়ে নেওয়া হল। সেখানে থাকতে-থাকতে রোগা হয়ে গেলেন তিনি, মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেল, অনেকেরই ধারণা হল তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন আগেই ছেড়ে দেওয়া হল তাঁকে। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তিনি তাঁর কোমরে একটা ছোট্ট থলির মধ্যে বেঁধে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতেন কিছু মহামূল্যবান জিনিস। সে জিনিসগুলো আর কিছু নয়, ওই তিনটে দাঁত।

"ছাড়া পাবার পর কোয়েনিংসওয়াল্ড নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এলেন আমেরিকায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্লাবে একদিন দুপুরে তিনি কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, কথায়-কথায় প্রাচীনকালের মানুষদের প্রসঙ্গ উঠল। একজন অধ্যাপক ঠাট্টা করে বললেন, মিঃ কোয়েনিংসওয়াল্ড, আপনি সেই জাইগ্যান্টোপিথিকাসের খবর রটিয়ে দিয়ে আমাদের খুব চমকে দিয়েছিলেন! দু' ইঞ্চি লম্বা দাঁত মানুষের মতন কোনও প্রাণীর হতে পারে? তা হলে তার মুখখানা কত বড় হবে?

"বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড এই কথা শুনে দারুণ চটে গেলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী, হয় না? দেখবেন? প্রমাণ চান? তা হলে দেখুন।

"সামনেই খাবারের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক পরিচারিকা। কোয়েনিংসওয়াল্ড কোমর থেকে সেই ছোট্ট থলিটা বার করে দাঁত তিনটে সেই খাবারের প্লেটের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, এগুলো তা হলে কী?

"অত বড় বড় দাঁত দেখে সেই পরিচারিকাটি 'ও মাগো!' বলে চিৎকার করে উঠল, তার হাত থেকে প্লেটটা পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। পরিচারিকাটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান। ছুটে এল আরও অনেক লোক। দাঁত তিনটেও ছিটকে কোথায় চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, একটা আর পাওয়া গেল না কিছুতেই। সেখানকার সব চেয়ার, সোফা, মেঝের কার্পেট উল্টেপাল্টে দেখা হল, কিন্তু একটা দাঁত যেন অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। দাঁতের শোকে বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড কাঁদতে লাগলেন শিশুর মতন। তারপর বেশিদিন আর তিনি বাঁচেনওনি।"

সন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এইটাই কি সেই তৃতীয় দাঁত?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তোর বুদ্ধি আছে দেখছি। ঠিক ধরেছিস! হ্যাঁ, এটাই সেই তৃতীয় দাঁতটা। অন্য দুটো দাঁতের একটা আছে আমেরিকার 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে। আর-একটা দাঁত কোয়েনিংসওয়াল্ড নিজেই তাঁর মৃত্যুর আগে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। তাঁর ধারণা ছিল, ওই দাঁত মানুষের সৌভাগ্য এনে দেয়। ওই দাঁত সঙ্গে ছিল বলেই জাপানিরা তাঁকে মারেনি। তৃতীয় দাঁতটা ওই হার্ভার্ড ক্লাবের এক পরিচারক চুরি করে। গোলমালের মধ্যে সে সেটা সরিয়ে ফেলেছিল চটপট। অনেকদিন পরে সে সেটা বিক্রি করেছিল স্যার আর্থার রকবটম নামে এক বৈজ্ঞানিকের কাছে। গতবার

বিলেতে গিয়ে আমি স্যার আর্থারের ছেলে লেননের কাছ থেকে এই দাঁতটা ধার করে এনেছি। লেনন আমার অনেকদিনের বন্ধু।"

সন্তুর কাছে এখনও সব কিছু পরিষ্কার হল না। তাহলে এই দাঁতটা কিসের? দাঁতটা পাওয়া গিয়েছিল পিকিংয়ে, এখন সেটাকে নিয়ে এই নেপালে আসার মানে কী?

সে জিজ্ঞেস করল, "এই দাঁতটা তাহলে কি ইয়েতির, কাকাবাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি? তুই ইয়েতি সম্পর্কে কী জানিস?"

"হিমালয়ের এই রকম উঁচু জায়গায় বরফের মধ্যে একরকম মানুষ থাকে, তারা খুব হিংস্র—"

"কেউ তাদের দেখেছে?"

"অনেকেই তো দেখেছে বলে। অবশ্য কেউ তাদের ছবি তুলতে পারেনি। আমার মনে হয় এখানে ইয়েতি আছে, কারণ শেরপা নোরবু-ভাই বাচ্চা ইয়েতির মূর্তি বানাচ্ছিল!"

"তাই নাকি? দেখতে হবে তো। তুই লক্ষ করেছিস, সেই মূর্তির পায়ে কটা আঙুল?"

"তা তো দেখিনি। কেন?"

"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ করতে হয়। ইয়েতির যে-সব পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়, সেই সব ছাপগুলোতেই কিন্তু পায়ের আঙুল মোটে চারটে। মানুষ তো দূরের কথা, গোরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জিদেরও পায়ে পাঁচটা আঙুল থাকে। পায়ে চারটে আঙুলওয়ালা মানুষের মতন কোনও প্রাণীর কথা কল্পনাও করা যায় না!"

সন্তু চুপ করে গেল। এতখানি সে জানত না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "যদি ইয়েতি নামে বাঁদর বা ভাল্লুক জাতীয় কোনও প্রাণী থাকেও, সেগুলোও কিন্তু ছ' সাত ফুটের চেয়ে লম্বা নয়। যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারাও কেউ বলেনি যে, ইয়েতি খুব লম্বা প্রাণী। সুতরাং এতবড় দাঁত ইয়েতির হতে পারে না!"

"তাহলে?"

"মহাভারতের ঘটোৎকচের কথা মনে আছে? সে এত লম্বা ছিল যে, কর্ণের বাণে সে যখন মারা যায়, তখন তার দেহের চাপেই মরে গিয়েছিল অনেক কৌরব-সৈন্য! রামায়ণ-মহাভারত পড়লে মনে হয়, এক সময় বনেজঙ্গলে কিছু খুব লম্বা জাতের মানুষ থাকত, তাদের বলা হত রাক্ষস। হয়তো সেই রকম এক-আধটা রাক্ষস এখনও রয়ে গেছে!"

"এখনও?"

"স্যার আর্থার রকবটম এই দাঁতটা নিয়ে মাইক্রো-কার্বন পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মতে, এটা দেড়শো-দু'শো বছরের বেশি পুরনো নয়। অর্থাৎ এই দাঁত যার মুখে ছিল, সে দেড়শো-দু'শো বছর আগেও বেঁচে ছিল। স্যার আর্থারের মতে, এরা কোনও আলাদা জাতের প্রাণী নয়। সাধারণ মানুষই এক-দু'জন হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে যেতে পারে, যদি তাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের গোলমাল দেখা দেয়।"

"আমরা সেইরকম কোনও লোককে খুঁজতে এসেছি এখানে?"

"না।"

"তবে?"

"আসল কারণটা এখন তোকে বলা যাবে না। যতক্ষণ না ঠিকমতন প্রমাণ পাচ্ছি, ততক্ষণ বলার কোনও মানে হয় না। তবে, আর-একটা কারণ আছে। তোকে বললাম না, বুড়ো

কোয়েনিংসওয়াল্ড মৃত্যুর আগে একটা দাঁত দিয়ে যান তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। এই মাইকেল শিপটনের এক ছেলের নাম কেইন শিপটন। তুই তার নাম শুনেছিস?"

"না।"

"অনেকেই তার নাম জানে। বিখ্যাত অভিযাত্রী। বছর দু'এক আগে সব খবরের কাগজে কেইন শিপটনকে নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছিল। কেইন শিপটন একটা ছোট দল নিয়ে এসেছিল এভারেস্ট অভিযানে। এই গম্বুজটার কাছেই তারা তাঁবু ফেলেছিল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা কেইন শিপটন এখান থেকে মাত্র দু'শো তিনশো গজ দূরের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তন্ন-তন্ন করে তাকে খোঁজা হয়েছে, তার মৃতদেহের কোনও সন্ধানই মেলেনি, এই দ্যাখ কেইন শিপটনের ছবি।"

কাকাবাবু কালো খাতাটার ভেতর থেকে একটা ছবি দেখালেন সন্তুকে। খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবি। একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের সাহেব, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, তার গলায় হারের মতন কী যেন একটা ঝুলছে।

কাকাবাবু সেখানে আঙুল রেখে বললেন, "এই হারের একটা লকেটে কেইন শিপটন সব সময় রেখে দিত তার বাবার বন্ধুর দেওয়া দাঁতটা। সে ওই দাঁতটাকে মনে করত সত্যিই একটা সৌভাগ্যের চিহ্ন। কিন্তু ওই দাঁতটা বুকে ঝুলিয়ে এখানে এসেছিল বলেই বোধহয় কেইন শিপটনের প্রাণ গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ তো, বৃষ্টি থেমেছে কি না।"

সন্তু গম্বুজের লোহার দরজাটা খুলে বাইরে উঁকি মারল।

এখানে এই এক অদ্ভুত। যখন-তখন বৃষ্টি, আবার একটু পরেই ঝকমকে রোদ। দুপুরে এমন বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল, আর থামবেই না সারাদিন। কিন্তু এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ফুটফুটে নীল।

কাকাবাবু উঠে এসে বললেন, "চল, একটু ঘুরে আসি।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে এই বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা খুব বিপজ্জনক। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছড়ানো থাকলে তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু এক-এক জায়গায় বরফ পাথরের মতন শক্ত আর সেখানেই পা পিছলে যায়।

একটা তাঁবুর দড়ির ওপর আলতোভাবে বসে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছিল মিংমা। ওদের দেখে সে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, "কিধার যাতা, সাব?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, আকাশ পরিষ্কার আছে, কালাপাথর পর্যন্ত গিয়ে দেখি যদি এভারেস্ট দেখা যায়।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে মিংমা বলল, "সন্তু সাব, গ্লাভস কাঁহা? গ্লাভস পরে আসুন। সনঝে হলেই বহুত শীত লাগবে!"

সত্যিই তো, সন্তু মনের ভুলে খালি হাতে চলে এসেছিল। শীত তো লাগবেই। তা ছাড়া, মাঝে-মাঝেই আছাড় খেয়ে পড়তে হয়, বরফে হাত লাগে। কাকাবাবু আগেই সাবধান করে দিয়েছেন,

বেশি ঠাণ্ডার মধ্যে খালি হাতে বরফ ছুঁলে ফ্রস্ট বাইট হতে পারে। বরফ কামড়ায়। তাতে অনেক সময় হয়তো আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়।

সন্তু গম্বুজে ফিরে গিয়ে গ্লাভস পরে এল।

চতুর্দিকে বরফে সাদা হয়ে গেছে। মিংমা আর কাকাবাবু এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। বরফের ওপর দিয়ে দৌড়োবার উপায় নেই। সন্তু বকের মতন লম্বা-লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল ওদের কাছে।

কাকাবাবু শেরপা মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি কেইন শিপটনের নাম শুনেছ?"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব্, সবকোই জানে শিপটন সাবের কথা। হাম দেখা হায় উনকো। ইতনা তাগড়া জোয়ান, মুখমে দাড়ি আর মোচ। আহা বেচারা মর্ গিয়া।"

"তুমি শিপটন সাহেবের দলের সঙ্গে এসেছিলে নাকি?"

"না, সাব। উস্ টাইম আমার বুখার হয়েছিল। পেট মে বহুত দরদ্!"

"তোমার চেনা কেউ এসেছিল শিপটনের সঙ্গে? নোরবু এসেছিল?"

"না, সাব, নরবু ভি আসেনি। লেকিন আমার দোস্ত্ শেরিং আয়া থা!"

"শিপটন কী করে মারা গেলেন, তুমি শুনেছ?"

"হাঁ, সাব। সবাই জানে। এহি তো জায়গামে ছিল উনাদের বেস্ ক্যাম্প। শিপটন সাবকে দেখে সবাই ভেবেছিল, এ সাব ঠিক এভারেস্ট পীক-এ উঠে যাবে। ইতনা থা উনকা তন্দুরস্তি।"

"মারা গেলেন কী ভাবে?"

"ব্যস, বিলকুল বদ্ নসিব। বহুত হিম্মত আর সাহস ছিল তো,

তাই একেলা একেলা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। পাহাড়মে এহি কানুন হায় সাব, কোথাও কেউ একেলা যাবে না। একেলা যানেসেই ভয়। দু-জন যাও, কুছ না হোবে। শিপটন সাব সে-কথা মানেননি। একেলা গেলেন, তারপর কোথায় বরফ তাঁকে টেনে নিল!"

"তার দেহটাও তো পাওয়া যায়নি।"

"নেহি মিলা। গরমিন্টের লোক এসে কত ঢুঁড়ল। আম্‌রিকা থেকে ভি আউর বহুত সাহাবলোক এসে ঢুঁড়ল। তবু মিলল না। শিপটন সাব সির্ফ বরফকা অন্দর গায়েব হো গিয়া।"

"কিন্তু মিংমা, এই বেস ক্যাম্প থেকে একজন লোক একা-একা হেঁটে আর কত দূর যেতে পারে? বেশি দূর তো যাবে না। এর মধ্যে কেউ কোনও খাদে পড়ে গেলে তার দেহ পাওয়া যাবে না কেন? খুব বড় খাদ তো এখানে নেই।"

"কভি কভি এইসা হোতা হ্যায়, সাব, বরফ মানুষকো অন্দর টান লেতা হ্যায়। হাঁ সাব, বরফ মানুষকে টেনে নেয়।"

সন্তু বলল, "ক্রিভাস!"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন। সন্তুকে তিনি যতটা ছোট মনে করেন, সে তো ততটা ছোট নয়, সে অনেক কিছু জানে।

সন্তু অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে কথাটা শিখেছে। সে বলল, "বরফের মধ্যে মাঝে-মাঝে ক্রিভাস গর্ত থাকে, তার মধ্যে পা ফস্কে পড়ে গেলেই একেবারে মৃত্যু।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছিস, কিন্তু কথাটা ক্রিভাস নয়। ফরাসিতে বলে ক্রভাস, আর ইংরেজিতে বলে ক্রেভিস। তুই দুটো মিলিয়ে একটা বাঙালি উচ্চারণ করে ফেলেছিস।"

মিংমাও ক্রেভিস কথাটা জানে। সাহেবদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছে। সে বলল, "না সাব, ইধার ক্রেভিস নেহি হ্যায়।

আরও দূরে আছে। লেকিন বরফ মানুষকে টেনে নেয়, ইয়ে, সাচ বাত হ্যায়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ-রকমভাবে আরও লোক মরেছে? যাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি?"

"হর এক্সপিডিশানেই তো একজন দু'জন আদমি মরে। কখনও লাশ পাওয়া যায়, কখনও পাওয়া যায় না। শেরপা মরে, কুলি মরে, সাহাব লোকভি মরে! গত বরষমে আমিও তো একবার মরতে মরতে বাঁচ গিয়া!"

সন্তু বলল, "এত বিপদ, তবু তোমরা এখানে আসো কেন?"

মিংমা গর্বের সঙ্গে বলল, "আমরা পাহাড়ি মানুষ। আমরা বিছানায় শুয়ে মরতে চাই না। বিছানায় শুয়ে মরে ডরপুক আর জেনানারা। আমরা পাহাড়মে, নেহি তো বরফের মধ্যে মরতে চাই। বরফমে মরো, শান্তি, বহুত শান্তি।"

মিংমা বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে দুটো হাত রাখল, যেন এর মধ্যেই সে মরে গেছে।

কাকাবাবু হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে বললেন, "আমরা যেমন বিকেলবেলা বেরিয়েছি, কেইন শিপটনও বেরিয়েছিল বিকেলে। বিকেলবেলা বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সে আর কতদূর যাবে? যতই সাহসী হোক অভিযাত্রী হিসেবে শিপটন নিশ্চয়ই এটুকু জানত যে, রাত্তিরবেলা তাঁবুর বাইরে থাকতে নেই। সুতরাং সে সন্ধের আগেই ফিরে আসবার কথা চিন্তা করেছিল নিশ্চয়। শিপটনের সঙ্গের লোকেরা বলেছে যে, পর পর তিন দিন শিপটন এইরকম বিকেলবেলা একা একা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একদিন সে তাঁবুতে ফিরে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল তার দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। তারা কেউ বিশ্বাস করেনি। শিপটনের এমনি

বানিয়ে-বানিয়ে মজার কথা বলার অভ্যেস ছিল।"

মিংমা বলল, "হাঁ, শিপটন সাব বহুত জলি আদমি থা। আমার দোস্ত শেরিং বলে যে, শিপটন সাব এমুন কথা বলতেন যে, হাঁসতে হাঁসতে পেটমে বেথা হয়ে যেত!"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিপটনের একটা ডায়েরি পাওয়া গেছে। তাতেও সে বানিয়ে-বানিয়ে ওই রকম কোনও মজার কথা লিখেছে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ডায়েরিতে সাধারণত কেউ মিথ্যে কথা লেখে না। অথচ সে যা লিখেছে, তাও বিশ্বাস করা যায় না!"

"শিপটন কী লিখেছিলেন, কাকাবাবু?"

কাকাবাবু তক্ষুনি সন্তুর কথার উত্তর না দিয়ে মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতবার এক্সপিডিশানে এসেছ, মিংমা?"

মিংমা মুচকি হেসে বলল, "সওয়া সাতবার আংকল সাব।"

"সওয়া সাতবার মানে?"

"এহি বার তো আধা ভি নেহি হুয়া, সিকি হুয়া।"

"ও, বুঝেছি। তা এতবার যে তুমি এসেছ, কখনও এইদিকে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ? ধরো ইয়েতি কিংবা বড় ভাল্লুক কিংবা কোনও দৈত্যদানো?"

"নেহি সাব! কভি নেহি!"

"তোমার চেনাশুনো কেউ দেখেছে?"

"কভি তো শুনা নেহি!"

"তুমি তেনজিং নোরগের নাম জানো?"

মিংমা অমনি সেলামের ভঙ্গিতে কপালে এক হাত ছুঁইয়ে বলল, "জরুর। শেরপা লোগকো গুরু হ্যায়, তেনজিং!"

"সেই তেনজিং নোরগে আমায় বলেছেন যে, তাঁর বিশ্বাস ইয়েতি বলে একরকম মানুষের মতন প্রাণী সত্যিই আছে। কর্নেল

হান্টও সেই কথা বলেন। অবশ্য স্যার এডমন্ড হিলারি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। তা তোমরা কেউ ইয়েতির কথা জানো না কিংবা মানো না ?”

মিংমার মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল। সে কোনও উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

“এদিকে এতবার অভিযাত্রীরা এসেছে, কেউ কিছু দেখেনি ?”

“সাব, একঠো বাত বলব !”

“বলো।”

“সাব, আপ ইয়েতি ঢুঁড়তে এসেছেন, এ-কথা যদি জেনে যায়, তবে কুলি লোগ সব ভেগে যাবে। ইয়েতি কেউ দেখেনি, তবু সবাই ইয়েতির নাম দেবতা মাফিক ভয় করে, ভক্তি ভি করে !”

“তাই নাকি ? তুমিও ভেগে যাবে না তো ?”

মিংমা নিজের বুকে চাপড় মেরে বলল, “নেহি সাব। মিংমা কভি ডরতা নেহি ! কিসিকো ডরতা নেই !”

“বাঃ ভাল কথা। আমি অবশ্য ইয়েতি খুঁজতে আসিনি।”

এর পর স্বভাব-গম্ভীর কাকাবাবু খানিকটা যেন ঠাট্টার সুরে বললেন, “ইয়েতি খোঁজা কি আমার কাজ ? আমি খোঁড়া মানুষ, ইয়েতি তাড়া করলে কি আমি পালাতে পারব ? আমি এসেছি এভারেস্টে উঠতে।”

যেন ইয়েতির তাড়া খেয়ে পালানোর চেয়ে এভারেস্টে ওঠা অনেক সহজ কাজ ! কথাটা বলে কাকাবাবু আপন মনে হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, “কাকাবাবু—”

কাকাবাবু বললেন, “ওই শিপটনের ডায়রিতে কী লেখা ছিল, সেটা জানতে চাইছিস তো ? বলছি। শিপটন লিখেছে যে, ওই যে সামনে কালাপাথর নামে ছোট পাহাড়টা, ওর কাছে একদিন

সন্ধের মুখে-মুখে ও একজন মানুষকে দেখেছিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষটি শিপটনের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, ঠিক কোদালের ফলার মতন তার দাঁত। অর্থাৎ মনে কর, একজন ঘটোৎকচের মতন মানুষ।”

“তারপর ?”

“সেই মানুষটি শিপটনকে দেখে তেড়েও আসেনি, কাঁচা খেয়েও ফেলেনি, আবার পালিয়েও যায়নি। সে শুধু শিপটনের দিকে একবার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, তার পরের মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।”

“অ্যাঁ ?”

“শিপটন সেই কথাই লিখেছে। তার চোখের সামনেই লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শিপটন বোধহয় একটা রূপকথা বলতে চেয়েছিল। ইয়েতি সম্বন্ধে যে অনেক রকম গল্প আছে, তার মধ্যে একটা আজগুবি গল্প হচ্ছে, ইয়েতিরা নাকি বরফের তলায় একরকম ঘাসের মতন গাছ জন্মায়, সেইগুলো খুঁজে-খুঁজে খায়। আর তার গুণে যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।”

মিংমা হো-হো হা-হা করে হাসতে লাগল। যেন সে হাসির তোড়ে মাটিতে লুটোপুটি খাবে !

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “এত হাসছ কেন ?”

মিংমা বলল, “কেয়া তাজ্জব কি বাত ! ইয়েতিরা ঘাস খায় আর তারপরেই ভ্যানিশ হয়ে যায়।”

কাকাবাবু বললেন, “পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠলে অনেকেই চোখে নানা রকম ভুল দেখে। অনেক অভিযাত্রীই এ-কথা লিখেছেন। গভীর সমুদ্রে যারা একা-একা বোট নিয়ে পাড়ি দেয়, তারাও নাকি দেখেছে যে, জল থেকে বিরাট চেহারার কোনও মানুষ উঠে আসছে। এ অনেকটা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার

মতন।"

মিংমা আবার হাসতে হাসতে বলল, "ঘাস খেয়ে ভ্যানিশ। হে-হে হা-হা!"

কাকাবাবু বললেন, "শিপটন ওই কথা ডায়েরিতে লিখেছে, তারপর সে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। তা হলে কি সে-ও ওই ঘাস খুঁজে পেয়ে খেয়ে দেখেছিল?"

মিংমা এই কথাতেও হাসতে লাগল। শেরপারা একবার হাসতে শুরু করলে আর সহজে থামতেই চায় না।

এই সময় সন্তু একটা জিনিস দেখতে পেল। ডান দিকে পনেরো-কুড়ি গজ দূরে একটা ছোট্ট সবুজ চারা গাছ, তাতে একটি সাদা রঙের ফুল ফুটে আছে। এখানে আশেপাশে কোনও গাছ নেই। হঠাৎ বরফের মধ্যে একটা ফুলগাছ এল কী করে?

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল, এইটাই বোধহয় বরফের মধ্যে সেই ঘাসের মতন গাছ, যা খেয়ে ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

বরফের মধ্যে যে দৌড়তে নেই, সে-কথা ভুলে গিয়ে সন্তু গাছটার দিকে দৌড়ল। কাকাবাবু আর মিংমা সামনের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন কথা বলতে বলতে।

সন্তু প্রায় গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে হোঁচট খেয়ে পড়ল। একটা হাত পড়ল গাছটার ওপরেই। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

ঠিক যেন কোনও গর্তের ওপর আলগা বরফ বিছানো, সন্তুর মাথাটা ঢুকে গেল বরফের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রকমভাবে নেমে যেতে লাগল নীচের দিকে। সেই অবস্থায় চ্যাঁচাবার উপায় নেই। তার পা দুটো ছটফট করতে লাগল ওপরে।

কাকাবাবু আর মিংমা কিছুই দেখতে পেলেন না, তখনও তাঁরা কথাবার্তায় মগ্ন।

বরফের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে সন্তু ভাবল, এই তার শেষ। কাকাবাবু আর মিংমা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার আর বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু মানুষ সব সময় বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে। সন্তুর দম আটকে আসছে, তবু সে পা দুটো বেঁকিয়ে নিজেকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এক সময় তার মাথা ঠেকল কিসে যেন। বরফের নীচে নিশ্চয়ই শক্ত পাথর আছে।

তখন সন্তু পায়ের চাপ দিয়ে মাথাটা তুলতে লাগল। সম্পূর্ণ মুখটা যখন বাইরে এল তখন মনে হল, আর এক মুহূর্ত দেরি হলে নিশ্বাসের অভাবে সন্তুর বুকটা বুঝি ফেটে যেত। সে হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে।

আদৌ কিন্তু সন্তু বাঁচল না। আলগা বরফের মধ্যে গেঁথে যেতে লাগল তার পা দুটো। ঠিক যেমন চোরাবালির মধ্যে মানুষ আস্তে আস্তে ডুবে যায়। সন্তু চিৎকার করল, "কাকাবাবু! মিংমা—!"

ওরা দুজনে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। ডাক শুনে ফিরে তাকাল। দেখে তিনি দৌড়ে আসতে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেলেন তিনি নিজেই। তিনি বলে উঠলেন, "মিংমা, আমাকে তোলবার দরকার নেই, তুমি সন্তুকে ধরো।"

মিংমা কিন্তু দাঁড়ায়নি। সে দৌড়বার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল সন্তুর দিকে। মিংমা অনেক রকম কায়দা জানে। খানিকটা ওইভাবে এসে সে হঠাৎ শুয়ে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে সন্তুর কাছে এসে বলল, "সন্তু সাব, হামারা হাত পাকাড়ো।"

চোরাবালির মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই বেশি বিপদ, তাই মিংমা শুয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সে সন্তুর হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর দু'জনেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল দূরে। কাকাবাবুও সেখানে চলে এসেছেন ততক্ষণে।

সন্তু বলল, "ক্রেভিস! ওখানে ক্রেভিস আছে, আমি তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম!"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "তুই আমাদের সঙ্গে আসছিলি, আবার ওদিকে গেলি কেন?"

"ওখানে একটা ফুলগাছ দেখেছিলাম।"

"ফুলগাছ? এই বরফের মধ্যে আবার ফুলগাছ আসবে কোথা থেকে?"

"হ্যাঁ, সত্যি সত্যি দেখেছিলাম। আমি হাত দিয়ে ধরেওছিলাম সেটাকে। তারপর বরফের মধ্যে ডুবে গেলাম!"

মিংমা বলল, "কভি কভি হোতা হ্যায়। একঠো দোঠো গাছ ইধার উধার হোতা হ্যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "বরফের মধ্যেও এ-রকম চোরাবালির মতন ব্যাপার থাকে? এ তো খুব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কেইন শিপটন তাহলে এ-রকমই একটা কিছুর মধ্যে পড়ে মারা যেতে পারে!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওটা কিন্তু খুব গভীর নয়। আগে তো আমি উল্টোভাবে পড়েছিলুম, মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল, তারপর মাথাটা এক জায়গায় ঠেকে গেল। নইলে তো আমি উঠতেই

পারতুম না !"

মিংমা বলল, "মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল ? বহুত জোর বাঁচ গিয়া।"

সন্তুর শরীরে কোথাও আঘাত লাগেনি বটে, কিন্তু তার সারা শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছে। একদম মৃত্যুর মুখোমুখি হলে এ-রকম হয়। সে মিংমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রইল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ফুলগাছটা কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "সেটা বরফের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এখানে একটা কিছু চিহ্ন দেওয়া দরকার। আবার যাতে কেউ ভুল করে ওখানে না যায়—"

কিন্তু কী দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হবে ? এখানে কোনও কাঠের টুকরো কিংবা পাথর-টাথরও কিছু নেই। মিংমাই বুদ্ধি বার করল একটা।

সে বসে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ মুঠোয় ভরে টিপে টিপে শক্ত করে একটা মূর্তি বানাতে লাগল। দেখতে দেখতে সেটা বেশ একটা ছোটখাটো গোরিলা কিংবা বাঁদরের মতন মূর্তি হয়ে উঠল।

মিংমা হাসতে হাসতে বলল, "দেখিয়ে সাব, এক টিজুটি বন গিয়া। নরবু কাঠের পুতুল বানায়, আমিও বরফের পুতুল বানাতে পারি।"

সন্তু আপন মনেই বলে উঠল, "ইয়েতির ছোটভাই টিজুতি !"

মিংমা গলা থেকে তার লাল রঙের রুমালটা খুলে নিয়ে সেটা পরিয়ে দিল ওই বরফের মূর্তিটার গলায়। তারপর সেই মূর্তিটাকে তুলে সাবধানে কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আর কতক্ষণ থাকবে। কাল রোদ্দুর উঠলেই তো গলে যাবে !"

মিংমা বলল, "কাল আমি এসে একঠো বড় ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়ে যাব ইধারে। কুলি লোগ্ আজ কেউ আসবে না এ সাইডে।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ আর কালাপাথরে যাওয়া যাবে না। এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে। চলো, বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলো !"

গম্বুজে ফিরে এসে সন্তু স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে শুয়ে পড়ল। তার শরীর এখনও দুর্বল লাগছে।

সন্তু ঘুমিয়েও পড়ল তাড়াতাড়ি। কাকাবাবু আলো জ্বেলে পড়াশুনো করতে লাগলেন।

এক সময় একটা স্বপ্ন দেখল সন্তু।

সে একা চুপি চুপি কাকাবাবুকে না জানিয়ে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মাঝরাতে। তার এক হাতে একটা শাবল আর অন্য হাতে একটা টর্চ। গম্বুজের সামনের তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে সে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। মালবাহকরা সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু একটা তাঁবু থেকে ভেসে আসছে মাউথ অর্গানের আওয়াজ। নিশ্চয়ই মিংমা। শুয়ে শুয়েও সে মাউথ অর্গান বাজায়।

সন্তু হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বিকেলবেলার সেই জায়গাটায়। মিংমার তৈরি বরফের পুতুলটা ঠিকই আছে। গলায় বাঁধা লাল রুমাল। মিংমার কায়দায় সন্তুও সেখানে শুয়ে পড়ে, তারপর গড়াতে গড়াতে মূর্তিটা ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর শাবল দিয়ে বরফ খুঁড়তে লাগল। একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করে কাকাবাবুকে সে চমকে দেবে! বরফ সরিয়ে সরিয়ে সে খুঁজতে লাগল ফুলগাছটা। অবশ্য শুধু ফুলগাছটা খুঁজতেই সে এখানে আসেনি। এ জায়গায় বরফের নীচে যে গর্ত, তা খুব গভীর নয়। এক জায়গায় সন্তুর মাথা ঠেকে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ঠেকে গিয়েছিল কিসে ? তখন সে পাথর বলেই ভেবেছিল,

কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সেটা যেন একটা লোহার পাত। লোহা ছুঁলে আর পাথর ছুঁলে আলাদা আলাদা রকম লাগে। জনমানবশূন্য জায়গায় বরফের নীচে লোহার পাত ?...

খুঁড়তে খুঁড়তে সন্তু ঠং করে একটা শব্দ শুনতে পেল। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল তার। তবে তো সে ঠিকই বুঝেছিল ! কাকাবাবু যখন শুনবেন... । উৎসাহের চোখে সে আরও জোরে জোরে খোঁড়বার চেষ্টা করতেই শাবলটা তার হাত থেকে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। সেটাকে তুলতে যেতেই সন্তুর মাথাটা আবার ঢুকে যেতে লাগল ভেতরে।

স্বপ্নের মধ্যেই সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আহ্, আহ্ !"

তারপরই সে ভাবল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? নিজেই আবার উত্তর দিল, কই, না তো, এই তো আমার মাথাটা ঢুকে যাচ্ছে বরফের মধ্যে, আমি মরে যাচ্ছি।

তারপর সে চোখ মেলে দেখল, আলো জ্বলছে। কোথাকার আলো ? কিসের আলো ?

এবার ভাল করে সন্তুর ঘুম ভাঙল। সে বুঝতে পারল, সে শুয়ে আছে গম্বুজের মধ্যে, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। বাবাঃ, কী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে ! বরফের নীচে লোহার পাত, এ কখনও হয় ?

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবু তাঁর বিছানায় নেই।

আবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল সন্তুর। এত রাতে কাকাবাবু কোথায় গেলেন ? স্বপ্নের মধ্যে সন্তু একা একা বরফ খুঁড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি তো কেউ একা একা এখানে বাইরে যায় না রাত্তিরবেলা।

সে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু !"

অমনি গম্বুজের ওপর থেকে কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "কী

হল ?"

কাকাবাবু এত রাতেও গম্বুজের ওপর বসে আছেন ? কোনও মানে হয় ? উনি কি রাতে একটুও ঘুমোবেন না ? এ-রকম করলে শরীর খারাপ হবে যে !

"কাকাবাবু, এখন কটা বাজে ?"

"সাড়ে নটা। কেন ?"

এখন রাত মোটে সাড়ে নটা ? যাঃ ! সন্তুর ধারণা সে বহুক্ষণ ঘুমিয়েছে। স্বপ্নটাই তো দেখল কতক্ষণ ধরে। কলকাতায় রাত সাড়ে নটার সময় কত রকম আওয়াজ। কলকাতা এখান থেকে কত দূরে !

খুব অস্পষ্টভাবে মাউথ অর্গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে বাইরে। মিংমা বাজাচ্ছে। সন্তু স্বপ্নের মধ্যেও এই শব্দটা শুনেছিল। আশ্চর্য না !

সন্তু একবার ভাবল, কাকাবাবুকে স্বপ্নটার কথা বলবে। তারপরই আবার ভাবল, না, দরকার নেই। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হেসে উঠবেন। বরফের নীচে লোহার পাত ! কাকাবাবু তাকে পাগলও মনে করতে পারেন। অথচ, সন্তুর এখনও স্বপ্নটাকে ভীষণ সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

একটু বাদে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের নীল রঙের আলো গম্বুজের জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। কাকাবাবু গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বাইরে বেরিয়েই সন্তু লাফাতে লাগল। ঠিক স্কিপিং করার মতন। বিছানা ছাড়ার পর প্রথম যে শীতের কাঁপুনিটা লাগে, সেটা এইভাবে তাড়াতে হয়। বেশ কিছুক্ষণ লাফাতে শরীরটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে।

সন্তুর লাফালাফির শব্দ শুনে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শরীর ভাল আছে তো ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, খুব ভাল আছি।"

"কাল রাতে তুই একেবারে অঘোরে ঘুমিয়েছিস। তোকে দু-তিনবার ডাকলুম—"

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ?"

"হ্যাঁ। কাল আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। তোকেও দেখাতে চেয়েছিলাম—"

কাকাবাবু স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে খুললেন। তারপর উঠে বসে বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো এগিয়ে দে তো !"

সন্তু ক্রাচ দুটো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখেছ কাল রাত্রে ?"

"দুটো আলোর বিন্দু। অনেক দূরে, প্রায় কালাপাথরের কাছটায়। চোখের ভুল নয়, ভাল করে দেখেছি।"

"আলোর বিন্দু ? ওখানে আলো আসবে কোথা থেকে ?"

"সেই তো কথা ! আমাদের লোকরা রাত্রে অতদূরে যাবে না। আলোর বিন্দু দুটো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল। ধরা যাক, ইয়েতি বলে যদি কোনও প্রাণী থেকেও থাকে, তা হলেও, ইয়েতিরা আলো নিয়ে ঘোরাফেরা করে, এ-রকম কখনও শোনা যায়নি !"

"কাকাবাবু, আলেয়া নয় তো ?"

কাকাবাবু আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, "বরফের মধ্যে আলেয়া ? কী জানি ! সেটাও ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে !"

পরদিন সকালেই কাকাবাবু মিংমাকে ডেকে বললেন, "তাঁবু গোটাও। আমরা এবার সামনের দিকে এগোব।"

মিংমা যেন আনন্দে একেবারে নেচে উঠল।

সে বলল, "এভারেস্টে যাব, সাব ? চলিয়ে সাব, আমি আপনাকে কান্ধে পর উঠাকে নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব। আমাদের এক নম্বর ক্যাম্প হবে কালাপাথরে।"

মিংমা ছুটে বেরিয়ে গেল অন্যদের খবর দিতে।

কাকাবাবু প্যাকিং বাক্স খুলে বার করলেন একটা ওয়্যারলেস সেট। এটাও তিনি এবার বিদেশ থেকে এনেছেন। বিদ্যুৎ ছাড়াই এটা ব্যাটারিতে চলে।

যন্ত্রটাকে চালু করতেই সেটের মধ্যে কর-র-র কট কট শব্দ শুরু হল। কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই একটু বাইরে যা।"

সন্তু গম্বুজের বাইরে চলে এল। কিন্তু মনে মনে খুব কৌতূহল রয়ে গেল তার। এই যন্ত্রটা কাকাবাবুকে আনতে সে দেখেছে, কিন্তু এর আগে কাকাবাবু ওটা একবারও ব্যবহার করেননি। কাকাবাবু কার সঙ্গে কথা বলছেন, আর এমন কী গোপন কথা, যা সন্তুর সামনে বলা যায় না ?

বাইরে এসে সন্তু দেখল, শেরপা আর মালবাহকরা এরই মধ্যে খটাখট শব্দে তাঁবুর দড়িবাঁধা খুঁটি তুলতে শুরু করেছে। সন্তুও ওদের সঙ্গে হাত লাগাল।

খানিকবাদে কাকাবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "যা সন্তু, এবার তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে।"

মিংমা বলল, "ইধার সে খানা খা কে জায়গা ? তাতেই সুবিধা হোবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আকাশ পরিষ্কার আছে, তাড়াতাড়ি রওনা হলে দুপুরের মধ্যে কালাপাথর পৌঁছে যাব। সেখানে খানা পাকানো হবে।"

মিংমা এক গেলাস ধোঁয়া ওঠা চা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কম সে কম এক গিলাস তো চা খেয়ে লিন।"

সন্তু গম্বুজের দিকে যাচ্ছিল, মিংমা তাকেও ডেকে বলল, "আরে সন্তু সাব, তুম ভি থোড়া চায়ে পি লেও।"

এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে যতবার চা খাওয়া যায় ততবারই ভাল লাগে। গরম গেলাসটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরাম লাগে খুব।

চা খেতে খেতে মিংমা জিজ্ঞেস করল, "আংকেল সাব, কালাপাথরমে তো আজই পহুঁছে যাব। সিখানে ফিন ক রোজ থাকব আমরা—"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "সেখানে থাকব কেন ? রাতটা কালাপাথরে ঘুমিয়ে আবার এগিয়ে যাব সামনের দিকে। এভারেস্টে যেতে হবে না ?"

মিংমা অবাকভাবে ভুরু তুলে বলল, "তব ইধারমে ইতনা রোজ কাঁহে ঠারা ? সাতদিন স্রিফ চুপচাপ বৈঠে বৈঠে..."

কাকাবাবু বললেন, "এখানে থাকার দরকার ছিল। এত ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই শরীরটাকে সইয়ে নেওয়া হল। ...আচ্ছা বলো তো, মিংমা, কালাপাথর থেকে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে কত দিন সময় লাগবে ?"

মিংমা বলল, 'আকাশের দেওতা যদি কৃপা করেন তো সাত রোজ, আট রোজের মধ্যেই পঁহুছে যাব।"

সন্তু বলে উঠল, "মোটে সাত আট দিন লাগবে ?"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব, উস সে জাদা দিন নেহি লাগে গা। সাউথ কল সে উঠ জায়েগা—তুম রহেগা হামারা সাথ।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তা হলে তো আমাদের সঙ্গে খাবার-দাবার যথেষ্টই আছে।"

মিংমা এর পর বিড় বিড় করে আপন মনেই যেন বলল, "আভি তক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা কি সত্যিই এভারেস্টে উঠতে যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না মানে ? আমি কি তোমাদের মিথ্যে কথা বলে এনেছি ? আমরা নিশ্চয়ই এভারেস্টে উঠব। চূড়ায় উঠতে পারলে এ দলের সবাই অনেক টাকা পুরস্কার পাবে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, নেপাল গভর্নমেন্ট দুই গভর্নমেন্টই পুরস্কার দেবে। দলের প্রত্যেককে।"

মিংমা চট করে কাকাবাবুর খোঁড়া পা-টার দিকে একবার তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, জিনিসপত্র গুছোতে গেলি না ?"

সন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল গম্বুজের দিকে।

ভেতরে ঢুকে সে প্রথমে খুব চমকে গেল, ঘরের মাঝখানে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে।

তারপর দেখল, সেই লোকটি হচ্ছে দ্বিতীয় শেরপা নোরবু।

নোরবুর পক্ষে এই গম্বুজের মধ্যে ঢোকা আশ্চর্য কিছু না। কাকাবাবুর জিনিসপত্র বার করতে হবে। কিন্তু নোরবু কোনও জিনিসপত্র বার করার বদলে কাচের বাক্সটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে

বসে আছে স্থির হয়ে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী নোরবু ভাই ?"

নোরবু যেন চমকে গেল খানিকটা, তারপর সেই অবস্থায় বসে থেকেই মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সন্তু সাব, ইয়ে কেয়া হ্যায়।"

সন্তু বলল, "ইয়ে দাঁত হ্যায়। একঠো দাঁত।"

নোরবু বলল, "কিসকা দাঁত ?"

সন্তু বলে ফেলতে যাচ্ছিল যে, ইয়েতির দাঁত ওটা। কিন্তু সামলে নিল, এরা সবাই ইয়েতির নামেই ভয় পায়। মিংমা বলেছিল, ইয়েতির কথা শুনলেই মালবাহকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কাকাবাবুও এই কাচের বাক্সটা ওদের সামনে কক্ষনো বার করেন না।

সে বলল, "মালুম নেহি।"

নোরবু তবুও জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কা দাঁত ইতনা বড়া নেহি হোতা হ্যায়। কিসিকা দাঁত হ্যায় এঠো ?"

নোরবু অন্য সময় প্রায় কথাই বলে না। খুব গম্ভীর। তাকে এত কথা বলতে দেখে সন্তু বেশ অবাক হল।

নোরবু বাক্সটা খুলে দাঁতটা বার করতে গেল। সন্তু অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, "আরে আরে, খুলো না, খুলো না।"

নোরবু বেশ রুক্ষভাবে বলল, "কাঁহে ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু বারণ করেছেন। ওটায় কারুর হাত দেওয়া নিষেধ।"

নোরবু বলল, "হাম চিজ তো দেখে গা।"

সন্তু এবার ধমক দিয়ে বলল, "বারণ করছি না, ওটায় হাত দিলে কাকাবাবু রাগ করবেন। নোরবু ভাই, তুমি এই প্যাকিং বাক্সটা বাইরে নিয়ে যাও বরং।"

নোরবু সে কথায় কান না দিয়ে কাচের বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নোরবুর এরকম ব্যবহার দেখে হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল সন্তুর। সে এক্ষুনি গম্বুজের বাইরে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে আনতে পারে। কাকাবাবু তাকে সব সময় এই বাক্সটা চোখে চোখে রাখতে বলেছেন।

কিন্তু সে কাকাবাবুকে ডাকল না, নোরবুর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলল, "কী হচ্ছে কী ? এই বাক্সটায় হাত দিতে বারণ করছি না ?"

নোরবু যেন কেমন হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে মতন। সে সন্তুকে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সন্তু ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, সেই অবস্থাতেই সে ক্যারাটের প্যাঁচে নোরবুর চোয়ালে কষাল এক লাথি।

সন্তুর চেয়ে নোরবু অনেক বেশি জোয়ান, তবু সেই আঘাতেই সে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

অমনি সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "এই রে।"

সন্তু ভয় পেয়ে গেছে। নোরবুর হাত থেকে ছিটকে কাচের বাক্সটাও পড়ে গেছে মাটিতে। নিশ্চয়ই ভেঙে চুরমার।

কিন্তু বাক্সটা ভাঙেনি। মাটিতে পড়ে সেটা সামান্য একটু লাফিয়ে উঠল। সেটা আসলে কাচের নয় ! খুব সূক্ষ্ম প্লাস্টিকের মতন জিনিসে তৈরি, ঠিক কাচের মতন দেখায়।

মাটিতে পড়ে নোরবু একেবারে হতভম্ব। সন্তুর মতন একটা বাচ্চা ছেলে প্যাঁচ কষিয়ে তাকে ফেলে দিল ! সে আবার উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তুর ওপর, সন্তু ঠিক সময় সরে গেল তার তলা থেকে। নোরবু আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল। গায়ে জোর থাকলেও নোরবু লড়াইয়ের কোনও নিয়ম জানে না।

নোরবু আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই কাকাবাবু ঢুকলেন

ভেতরে। নোরবুকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, "কী হল ?"

নোরবু কোনও উত্তর দিল না।

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। নোরবু যে হঠাৎ এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে শুরু করেছে, সে কথা শুনলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। ওকে কোনও কঠিন শাস্তিও দিতে পারেন। এমনকি নোরবুকে হয়তো আর অভিযানে সঙ্গে নেবেনই না।

সন্তু বলল, "কিচ্ছু হয়নি। ও এমনি পা পিছলে পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাচের বাক্সটা নিয়ে কী করছিস ?"

"এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"না, ওটা আমার কাছে থাকবে। নোরবু, তুমি লোকজনকে ডেকে এ ঘরের মালপত্র বার করার ব্যবস্থা করো।"

নোরবু কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ঠিক সকাল ন'টার সময় যাত্রা শুরু হল।

সন্তু এর আগে কালাপাথরের ওপরে উঠেছিল একবার। খুব বেশি দূর নয়। যদি তুষারপাত শুরু না হয়, তাহলে ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

মিংমা আর নোরবু চলেছে একেবারে সামনে। তাদের পেছনে সন্তু। মিংমা তার স্বভাব অনুযায়ী নানারকম মজার কথা বলতে

বলতে চলেছে। নোরবু গম্ভীর। সে অন্য সময়ও এরকম গম্ভীর থাকে, কিন্তু আজ তার মুখখানাই যেন বদলে গেছে। সন্তু মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছে নোরবুকে। কিন্তু নোরবু একবারও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

বরফের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলা। কিছুতেই খুব জোরে যাওয়া যায় না। সকলেরই সঙ্গে কিছু কিছু মালপত্র। এমন কী কাকাবাবুরও পিঠের সঙ্গে একটা ব্যাগ বাঁধা। কালাপাথরের ওপরে উঠলে এভারেস্টচূড়া একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। এভারেস্ট ! সত্যিই কি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা হবে ? এত ছোট একটা দল নিয়ে ? কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে উঠবেন ? সন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

ঘণ্টা খানেক একটানা চলার পর কাকাবাবু দূর থেকে সন্তুর নাম ধরে ডাকলেন।

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কাকাবাবু একেবারে পিছিয়ে পড়েছেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি আবার চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, আমার ওষুধ—।"

কাকাবাবুকে কয়েকটা ওষুধের ট্যাবলেট খেতে হয় দিনে তিনবার। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পকেট থেকে ট্যাবলেটের কৌটো বার করতে তাঁর অসুবিধে হয় বলে সন্তু তখন সাহায্য করে কাকাবাবুকে। কিন্তু এখন তো ওষুধ খাবার সময় নয়। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়েছেন !

সন্তু কাকাবাবুর কাছে ফিরে এল।

কাকাবাবু তাঁর কোটের ডান পকেটটা দেখিয়ে বললেন, "ওখান থেকে ওষুধ বার কর।"

"আপনার কষ্ট হচ্ছে, কাকাবাবু ?"

"কিচ্ছু না। শোন্। গম্বুজের চূড়া থেকে রাত্তিরবেলা যে

আলোর বিন্দু দেখেছিলাম, তা কতটা দূরে ছিল বলে তোর মনে হয় ?"

"ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"আমার আন্দাজ এই রকম জায়গা থেকে।"

সন্তু চারদিকটা দেখল।

কাকাবাবু একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে বললেন, "তুই অন্যদের নিয়ে এগিয়ে যা। কারুর থামবার দরকার নেই। ওদের বলবি, আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি এই জায়গাটা খানিকটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "মিংমাদের এগিয়ে যেতে বলে আমি থাকব আপনার সঙ্গে ?"

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "না, তোর থাকার দরকার নেই। তুই ওদের সঙ্গে যা ! ওদের বল, আগে গিয়ে কালাপাথরের কাছে তাঁবু ফেলতে !"

কাকাবাবু একটা পাথরের ওপর বসে নিশ্চিন্তভাবে পাইপ ধরালেন।

শেরপা ও মালবাহকের দলটা অনেক দূরে চলে যাবার পর কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। ডান দিকের এক জায়গায় তাঁর চোখটা থেমে গেল। পকেট থেকে ছোট্ট একটা দূরবিন বার করে সেদিকটা দেখতে লাগলেন ভাল করে। আপনমনেই বললেন, হুঁ !

ডানদিকে বেশ খানিকটা এগোবার পর এক জায়গায় দেখা গেল বরফের মধ্যে পর পর পাঁচ-ছ'টা ছোট গর্ত। ঠিক হাতির পায়ের চাপের গর্তের মতন।

কাকাবাবু চমকালেন না। ধীরে-সুস্থে তাঁর পিঠের ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখলেন। ক্রাচ দুটোও পাশে রেখে তিনি সেই একটি

গর্তের পাশে বসলেন।

গর্তটা যে কারুর পায়ের চাপে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে হাতির পায়ের চেয়ে মানুষের পায়ের ছাপের সঙ্গেই বেশি মিল। শুধু তফাত এই যে, কোনও মানুষের পায়ের চাপে ওরকম গর্ত হতে পারে না। খুব ভাল করে লক্ষ করলে সেই পায়ের ছাপে আঙুলের চিহ্নও বোঝা যায়। তবে পাঁচটা নয়, চারটে আঙুল। বুড়ো আঙুল বা কড়ে আঙুল নেই, সব কটা আঙুলই সমান।

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "ইনক্রেডিবল ! অ্যামেজিং !"

কোটের পকেট থেকে ছোট ক্যামেরা বার করে তিনি খচাখচ করে গর্তগুলোর ছবি তুলতে লাগলেন। ঠিক ছ'খানা পায়ের ছাপ। আজ সকাল থেকেই রোদ। বরফের ওপর সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপ এই রকম রোদে একটু পরেই গলে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই ছ'টা ছাপ গলেনি।

অনেকক্ষণ ধরে কাকাবাবু ব্যস্ত রইলেন সেই পায়ের ছাপগুলো নিয়ে। নানাভাবে সেগুলো মাপতে লাগলেন আর ছবিও তুললেন অনেকগুলো। তাঁর মুখে যেন একটা অখুশি অখুশি ভাব। চোখের সামনে দেখতে পেয়েও তিনি যেন পায়ের ছাপগুলোকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

একটু পরে দূরে একটা শব্দ হতে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। বেশ দূর থেকে কে যেন ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ওপর দিকে দু'হাত তোলা, মুখ দিয়ে কী যেন একটা আওয়াজও করছে।

কাকাবাবু বিচলিত হলেন না। রিভলবারটা বার করে সে দিকে চেয়ে বসে রইলেন। একটু পরেই তিনি দেখলেন, শুধু একজন নয়, পেছনে আরও কয়েকজন আসছে।

তখন তিনি রিভলবারটা কোটের পকেটে আবার ভরে ফেললেন। ইয়েতি-টিয়েতি কিছু নয়, ছুটে আসছে তাঁর নিজের লোকরাই।

বরফের ওপর দিয়ে দৌড়নো অতি বিপজ্জনক, তবু যেন প্রাণভয়ে, একবারও আছাড় না খেয়ে প্রথমে এসে পৌঁছল মিংমা।

খুব জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে দম নিয়ে মিংমা বলল, "স্যার, ইয়েটি, ইয়েটি, ইতনা বড়া— !"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি ? তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

মিংমা বলল, "নোরবু দেখেছে সাব, আপ উঠিয়ে, আভি ভাগতে হবে এখান থেকে !"

এর মধ্যে সন্তু এসে পৌঁছল।

তাকে দেখেই কাকাবাবু খুব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই দেখেছিস, সন্তু ? নিজের চোখে ?"

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটোয় ভয় আর বিস্ময় মাখান। সে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "কী রকম দেখতে ? মানুষের মতন, না গোরিলার মতন ?"

সন্তু দু-তিনবার ঢোঁক গিলে বলল, "খুব ভাল করে দেখতে পাইনি, অনেকটা দূরে ছিল, আমরা কালাপাথরের কাছাকাছি যেতেই নোরবুভাই আর কুলিরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল...আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, চোখ তুলেই দেখি, কী একটা বিরাট কালো জিনিস সাঁত করে সরে গেল পাহাড়ের আড়ালে।"

কাকাবাবু দারুণ রেগে ধমক দিয়ে বললেন, "ইডিয়েট ! খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে পারলি না ? এতই প্রাণের ভয় ? তা হলে এসেছিস কেন ?"

সন্তু মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিংমা বলল, "আপ কেয়া বোল রহা হ্যায়, সাব ? ইয়েটির সামনে গেলে কোনও মানুষ বাঁচে ? বাপ রে বাপ ! আমরা খুব টাইমে ভেগে এসেছি !"

কাকাবাবু চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "তোমরা ভেগে এলে, না ইয়েতিটাই ভেগে গেল। সে কি তোমাদের তাড়া করে এসেছিল ?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে মিংমা বরফের একটা গর্তের দিকে তাকিয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, "ইয়ে কেয়া হ্যায়, সাব ? হে রাম ! হে মহাদেও ! এই তো ইয়েটির পায়ের ছাপ ! ইখানে ভি ইয়েটি এসেছিল !"

এরপর এসে পড়ল নোরবু আর মালবাহকরা। তারা সবাই মিলে একসঙ্গে এমন চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করল যে, প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না।

কাকাবাবু জোরে বললেন, "চুপ ! আস্তে ! কে কী দেখেছ, সব একে একে বুঝিয়ে বলো।"

সবাই এক মুহূর্ত চুপ করে গিয়ে আবার মুখ খোলার আগেই নোরবু এগিয়ে এল কাকাবাবুর সামনে। খানিকটা রুক্ষভাবে বলল, "আভি লৌট চলো সাব ! এক মিনিট টাইম নেহি !"

কাকাবাবু বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি। ইয়েতি এলেও আমি তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারব।"

ইতিমধ্যে মালবাহকরাও বড় বড় পায়ের ছাপের গর্তগুলো দেখতে পেয়েছে। তারপর এক দারুণ গণ্ডগোল শুরু হল। মালবাহকরা শুরু করল কান্নাকাটি আর শেরপা দু'জন আরম্ভ করল তর্জন-গর্জন। তারা এক্ষুনি ফিরে যেতে চায়।

কাকাবাবু তাদের একটুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর

হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বেশ তো, ফিরে যাও।"

কিন্তু ওরা কাকাবাবু আর সন্তুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। গভর্নমেন্টের লোক ওদের আসবার সময়ই বলে দিয়েছে কাকাবাবুর সবরকম হুকুম পালন করতে। এখন কাকাবাবুকে বিপদের মুখে ফেলে যেতেও ওরা রাজি নয়। তাহলে ফিরে গেলে শাস্তি পেতে হবে।

কাকাবাবু কিছুতেই যেতে রাজি নন। সন্তু কাকাবাবুর জেদি স্বভাবের কথা জানে। বিরাট কালো ছায়াটা এক পলকের জন্য দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠেছিল দারুণভাবে। তার মনে পড়েছিল কিং কঙের কথা। কিন্তু এখন অনেকটা ভয় কমে গেছে। সেও কাকাবাবুর সঙ্গে থাকবে।

নোরবু হঠাৎ চিৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, আর অমনি মালবাহকেরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে। কোনওরকম বাধা দেবার আগেই তাদের দু'জন কাঁধে তুলে ফেলল কাকাবাবুকে। অন্য একজন সন্তুর কোটের কলার খিমচে ধরে দৌড়তে লাগল।

সন্তু ইচ্ছে করলে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে পারত কিন্তু ওরা কাকাবাবুকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, সেও চলতে লাগল সেদিকে।

সবাই বারবার পেছন ফিরে দেখছে। ইয়েতি ওদের তাড়া করে আসছে কিনা দেখবার জন্য।

গম্বুজটার কাছাকাছি ফিরে আসবার পর কাকাবাবু বললেন, "ভালই হল, আমাকে আর এতখানি কষ্ট করে হেঁটে আসতে হল না। এবার আমায় নামিয়ে দাও!"

নোরবু বলল, "নেহি!"

মিংমা বলল, "আমরা আজই থিয়াংবোচি ওয়াপস্ যাব।

অতদূর যেতে না পারি যদি তা হলে ফেরিচা গাঁওমে রুখে যাব।"

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া হলেও তাঁর দুই হাতে যে সাঙ্ঘাতিক জোর, তা এরা জানে না। এক ঝটকায় তিনি নেমে এলেন মাটিতে। তবে, অন্য লোকদের মতন তিনি মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁর একটু সময় লাগে। সেই সুযোগ মালবাহকরা তাঁকে আবার তোলার চেষ্টা করতে যেতেই কাকাবাবু শুয়ে থাকা অবস্থাতেই রিভলবার উঁচু করলেন। কড়া গলায় বললেন, "মানুষ খুন করা আমি পছন্দ করি না। আমায় গুলি চালাতে বাধ্য কোরো না!"

সবাই ভয়ে সরে দাঁড়াল।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "সন্তু, আমার ক্রাচ দুটো দে।"

মিংমার কাছে ক্রাচ ছিল, সে এগিয়ে দিল। কাকাবাবু তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "তুমি যে বলেছিলে, কোনও কিছুতেই ভয় পাও না? এখন ইয়েতির নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেলে?"

মিংমা বলল, "সাব, আমায় একটা বন্দুক দাও, তাহলে আমার ডর লাগবে না। কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই!"

নোরবু মিংমাকে বকুনি দিয়ে হাত-পা নেড়ে নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল। মোটামুটি তার মানে বোঝা গেল এই যে, ইয়েতি সাক্ষাৎ শয়তান, বন্দুকের গুলিতে তাদের কিছু হয় না। ইয়েতি কারুর চোখের দিকে চাইলেই সে মরে যায়।

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা যদি ভয় পাও তোমরা চলে যেতে পারো। আমি সকলের টাকাপয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা এখানে থাকব।"

মিংমা খুব কাতরভাবে বলল, "সাব, আপনিও ওয়াপস্ চলুন

আমাদের সঙ্গে। পরে আবার বহুত বন্দুক পিস্তল আর সাহেবলোকদের নিয়ে এসে ইয়েটির সঙ্গে লড়াই করব।"

কাকাবাবু বললেন, "সাহেবলোক ছাড়া বুঝি অন্য কেউ ইয়েতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে না ? যাও, যাও, তোমরা যাও !"

সত্যি-সত্যি একটুক্ষণের মধ্যেই সবাই চলে গেল।

চারদিক হঠাৎ যেন দারুণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এ ক'দিন গম্বুজের বাইরে মানুষজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যেত তবু, এখন চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফ, তার মাঝখানে শুধু এই দু'জন। একেবারে নিঝুম দুপুর।

কাকাবাবু বললেন, "খিদে পায়নি ? খাওয়াদাওয়ার কী হবে ? সন্তু, তুই বিস্কুটের টিনটা বার কর। আর দ্যাখ, চীইজ আছে কি না।"

সন্তু বিস্কুটের টিনটা খুঁজতে খুঁজতে মনে মনে ভাবতে লাগল, এখন না-হয় বিস্কুট খেয়ে খিদে মেটানো হবে। কিন্তু এর পর ? শেরপা আর মালবাহকরাই রান্না-বান্না করত। শেরপাদের সাহায্য ছাড়া সন্তুরা তো এখান থেকে পথ চিনে ফিরতেও পারবে না।

বিস্কুট আর চীইজ খেতে-খেতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, সন্তু, ভয় পেয়ে গেলি নাকি ?"

সন্তু শুকনো গলায় বলল, "না !"

"তুই সত্যি-সত্যি কিছু একটা দেখেছিলি ? না নোরবুর চিৎকার শুনেই ভেবেছিস..."

"সত্যিই দেখেছি...তবে মাত্র এক পলকের জন্য..."

"কোনও মানুষ নয় তো ?"

"না, মানুষের চেয়ে অনেক বড়, খুব কালো, সারা গায়ে লোম।"

"মুখ দেখেছিলি ? ভাল্লুক-টাল্লুক নয় তো ?"

"মুখটা দেখতে পাইনি তবে ভাল্লুক নয়...সোজা খাড়া...।"

"তোর মনে হয়, তুই ইয়েতিই দেখেছিস ?"

"তা ছাড়া আর কী হবে ?"

"তা হলে রাত্তিরবেলা গম্বুজের ওপর থেকে আমরা ইয়েতিই দেখেছিলাম, তাই না ?"

"তুমি তো ইয়েতির পায়ের ছাপও দেখলে। অত বড় বড় পা !"

"হুঁ ! শেষ পর্যন্ত আমরা ইয়েতির পাল্লায় পড়লুম ! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাত্তিরবেলা ইয়েতিরা কি হাতে হ্যারিকেন কিংবা টর্চ লাইট নিয়ে ঘোরে ? আমরা আলো দেখলুম কিসের ?"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর এই প্রশ্নের একটা উত্তর তার মনে পড়ে গেল। সে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, একটা জিনিস...মানে, এমনও তো হতে পারে যে, রাত্তিরবেলা ইয়েতিদের চোখ আগুনের মতন জ্বলে ? যেমন বনের মধ্যে বাঘ-সিংহের চোখ রাত্তিরে জ্বলজ্বল করে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? বাঘ-সিংহের মতো ? মানুষের মতন চেহারা, অথচ বিরাট লম্বা, রাত্রে চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়...এ-রকম একটা প্রাণী...যদি জ্যান্ত ধরতে পারি কিংবা ছবি তুলতেও পারি...তা হলে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আসল ব্যাপার কী জানিস, মানুষের মধ্যে দু'রকম প্রবৃত্তি থাকে। মানুষ একদিকে চায় পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করতে। সেই জন্য সব জায়গায় খুঁজে-খুঁজে সব কিছু বার করে। আবার মানুষ অন্য দিকে চায় এখনও পৃথিবীতে অজানা, অদেখা, অদ্ভুত রহস্যময় কিছু-কিছু জিনিস থেকে যাক। যেমন এই ইয়েতি।"

একটু থেমে কাকাবাবু বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। এই

গম্বুজের মধ্যে আমরা থাকব, এখানে ইয়েতি কিছু করতে পারবে না। আজ সকালেই আমি থিয়াংবোচির সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেছি। ওখান থেকে আর একটি দল পাঠাবে। তারা এসে পড়বে কাল বিকেলের মধ্যেই।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাকাবাবু শুয়ে পড়ে পাইপ টানতে লাগলেন। সন্তু একবার গিয়ে উঁকি মারল গম্বুজের বাইরে। রোদ চলে গিয়ে আবার মেঘ এসেছে। বাইরেটা অন্ধকার-অন্ধকার। দূরের দিকে তাকালে অকারণেই গা ছম ছম করে।

কাকাবাবু বললেন, "গেটটা ভাল করে বন্ধ করে রাখ! আজ আর বাইরে যাসনি। তবে ইয়েতি নিশ্চয়ই এতদূরে আসবে না।"

কিছুই করার নেই বলে সন্তুও এসে শুয়ে পড়ল। আর ঘুমিয়ে পড়ল একটু বাদেই।

তার ঘুম ভাঙল একটা জোর শব্দে। কে যেন লোহার দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। কাকাবাবুও উঠে বসেছেন, তাঁর হাতে রিভলবার।

দরজায় যত জোরে আওয়াজ হল, সন্তুর বুকের মধ্যে যেন তার থেকেও জোরে আওয়াজ হতে লাগল। এই বরফের রাজ্যের মধ্যে সে আর কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।

কাকাবাবু আর সন্তুর খাট যেখানে পাশাপাশি পাতা, সেখান থেকে গম্বুজের দরজাটা দেখা যায় না। কাকাবাবু বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন, হাতে রিভলবার। তিনি গভীরভাবে

কোনও-কিছু চিন্তা করতে বসেছেন যেন এই সাংঘাতিক সময়ে।

দরজার ওপর দুমদুম আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল।

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ দেয়ার?"

কোনও উত্তর এল না। আওয়াজটাও হঠাৎ থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "লোহার দরজাটা বেশ শক্ত। সহজে কেউ ভাঙতে পারবে না। সন্তু, তুই গম্বুজের ওপরে উঠে দ্যাখ তো বাইরে কিছু দেখা যায় কি না।"

সন্তু বিছানায় শুয়ে পড়ার সময় জুতো খুলে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি জুতো পরে নিল আবার। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে গম্বুজের সিঁড়িতে পা দিতেই আবার দুমদুম শব্দ হল দরজায়।

সন্তু তরতর করে উঠে গেল ওপরে। জানলাটা দিয়ে ব্যগ্র হয়ে তাকাল বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। গম্বুজের ওপর থেকে ঠিক নীচের জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্তু বেশ জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে? কে ওখানে?"

এবারও কোনও সাড়া নেই।

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজাটার কাছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "উত্তর দিচ্ছ না কেন? কে দরজা ধাকাচ্ছ? পরিচয় দাও!"

এর উত্তরে দরজায় আবার দুমদাম শব্দ।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কে, মিংমা? নোরবু? কে বাইরে?"

তবু কোনও সাড়া নেই। কাকাবাবু দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে বললেন, "কে আছ। সরে দাঁড়াও! খুলেই আমি গুলি করব!"

ওপর থেকে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, খুলবে না, খুলবে না!"

কাকাবাবু দরজার মস্ত বড় ছিটকিনিটা ধরে এমনিই একটা শব্দ করলেন। যেন তিনি দরজাটা খোলার ভান করছেন। আসলে দরজাটা খুললেন না।

সন্তু তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "ওপর থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আমার মনে হয় নোরবু কিংবা মিংমা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে! না হলে এখানে আর অন্য মানুষ আসবে কী করে? আর কোনও মানুষ হঠাৎ এসে পড়লেই বা সাড়া দেবে না কেন?"

সন্তু থমথমে মুখে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কাকাবাবু এখনও কোনও মানুষের কথা ভাবছেন? এ তো ইয়েতির কাণ্ড! সন্তু নিজের চোখেই তো ইয়েতির ছায়া দেখেছে। ইয়েতি দরজা ভেঙে গম্বুজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। সন্তুর শরীরটা এত কাঁপছে যে কিছুতেই সে নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না।

কাকাবাবু আরও কয়েকবার ইংরেজি, বাংলা, হিন্দিতে 'কে? কে?' জিজ্ঞেস করলেন। কোনও উত্তর পেলেন না। দুমদুম আওয়াজটাও একটু পরে থেমে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ।

কাকাবাবু আর সন্তু দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ শব্দটা না হওয়ায় কাকাবাবু বললেন, "এবার দরজাটা খুলে দেখা যাক।"

সন্তু প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, "না। কাকাবাবু, ওরা সুযোগেরই অপেক্ষা করছে। আমরা দরজা খুললেই—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা মানে কারা? আমি তো ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোরা যদি ইয়েতি দেখেও থাকিস, কিন্তু ইয়েতি কখনও মানুষকে তাড়া করে এসেছে, এ-রকম

তো শোনা যায়নি! যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারা সবাই বলেছে, ইয়েতি হয় খুব ভিতু অথবা লাজুক প্রাণী। তারা মানুষ দেখলেই পালিয়ে যায়। তোদের দেখেও তো পালিয়েছে। তারা হঠাৎ গম্বুজের দরজায় এসে ধাক্কা দেবে কেন?"

একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে কাকাবাবু আবার বললেন, "তুই আমার পেছন দিকে সরে যা, সন্তু! ইয়েতি হোক বা যাই হোক, রিভলবারের গুলির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।"

কথা বলতে বলতেই কাকাবাবু বড় ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন দরজায়।

দরজাটা খুলল না।

কাকাবাবু আরও জোরে টানলেন। এবারও খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, "কী হল? পুরনো আমলের দরজা, ওদিক থেকে ধাক্কা দেওয়ায় বোধহয় খুব এঁটে গেছে। তুই একটু হাত লাগা তো সন্তু।"

তখন কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনে মিলেই ঠেলল দরজাটা। কিন্তু তবু দরজাটা খোলার লক্ষণ নেই। সন্তু দুমদুম করে লাথি মারতে লাগল। তবু এক চুলও ফাঁক হল না।

একটু পরেই ওরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এবার কাকাবাবুর কপালেও ঘাম দেখা দিল।

দরজাটা এমনভাবে বাইরে থেকে বন্ধ করল কে? কীভাবেই বা বন্ধ করল? বাইরের দিকে দুটো মোটা কড়ায় তালা দেবার ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবুরা এখানে আসবার আগে গম্বুজটার দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়াই ছিল। কাকাবাবু নেপাল সরকারের কাছ থেকে সেই তালার চাবি এনেছিলেন। কেউ যদি বাইরে থেকে অন্য কোনও তালা লাগায়ও, তাহলেও দরজাটা ঠেললে

খানিকটা ফাঁক হতই। দুপাল্লার দরজা, বাইরে থেকে কখনওই এমন শক্তভাবে বন্ধ হয় না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "তাহলে বুঝলি তো, এটা ইয়েতির কাজ নয়। মানুষের কাজ!"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "আমরা ভাবছিলুম, দুমদুম করে ওরা বুঝি আমাদের দরজা খুলতে বলছে। আসলে বোধহয় ব্যাপারটা উল্টো। ওরা দরজার বাইরে একটা লোহার পাটি কিংবা ওইধরনের কিছু লাগিয়ে দিয়ে গেছে। হাতুড়ি-টাতুড়ি পেটার জন্য ওই রকম দুমদুম শব্দ হচ্ছিল।"

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, তাহলে তারা বেরুবে কী করে? কারা এমন করল? মিংমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, সে কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না। তাছাড়া তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলে মিংমাদের লাভ কী?

সে মরিয়া হয়ে দরজাটার গায়ে খুব জোরে আর-একবার লাথি কষাল। দরজাটা একটুও নড়ল না।

কাকাবাবু বললেন, "ওতে কোনও ফল হবে না!"

তিনি খাটের কাছে ফিরে গিয়ে বসে পড়ে পাইপ ধরালেন। তারপর আবার হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "সন্তু, ছিটকিনিটা বন্ধ করে দে। ওরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করেছে। আমাদের দিক থেকেও বন্ধ রাখা দরকার। নইলে ওরা হঠাৎ ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।"

সন্তু ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল কাকাবাবুর কাছে। তার শরীরে যেন একটুও শক্তি নেই আজ। এই গম্বুজের মধ্যে তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে? এই ছোট্ট একটা আধো-অন্ধকার ঘর, খাবার-দাবারও বেশি নেই, এ-রকম ভাবে আর কতদিন বাঁচা

যাবে? এর আগে সন্তু যে-কয়েকটি অভিযানে বেরিয়েছে কাকাবাবুর সঙ্গে, কোনওবার সে এত হতাশ হয়ে পড়েনি। এবারে সবচেয়ে যেটা অস্বস্তিকর লাগছে, সেটা হল এই যে, শত্রু যে কে, তা-ই এখনও জানা গেল না। এই বরফের রাজ্যে কে বা কারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসতে পারে, সে কথাটাই তার মাথায় ঢুকছে না।

সে ভেবেছিল, এবার সে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে এসেছে। পথে অনেক বিপদ থাকবে তো বটেই, কিন্তু কেউ যে শত্রুতা করবে, সে-কথা সে কল্পনাও করেনি আগে। কাকাবাবুর কথাই ঠিক, ইয়েতি কখনও এইভাবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না।

কাকাবাবু খানিকটা আপন মনেই বললেন, "বাইরে থেকে কেউ এসে খুলে না দিলে এ দরজা ভেঙে বেরুনো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সাহায্যের জন্য আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু ওদের এসে পৌঁছতে অন্তত দু-তিন দিন লেগে যাবে!"

সন্তু বলল, "দু-তিন দিন? তার মধ্যে তো আমরা এখানে দম বন্ধ হয়েই মারা যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরের জানলা দিয়ে হাওয়া আসে...তা হলেও দু-তিন দিন এইটুকু ঘরের মধ্যে থাকা খুবই কষ্টকর, ওরা যদি আবার এসে দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে..."

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা মানে কারা?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো কথা, ওরা মানে কারা, তা তো আমিও বুঝতে পারছি না। কারা রাত্তিরবেলা বরফের মধ্য দিয়ে আলো নিয়ে হাঁটে? অত বড় বড় পায়ের ছাপ কি সত্যিই ইয়েতির? খাটের তলা থেকে তুই ওয়্যারলেস সেটটা বার কর।"

দু'কানে হেডফোন লাগিয়ে কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর

পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ কর্-কর্ কর্-গর্র্-গর্ আওয়াজ, তারপর কাকাবাবু হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, "হ্যালো হ্যালো, পীক্ নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন কলিং বেস, পীক্ নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী, হ্যালো, রজার, ক্যান ইয়ু গেট মী...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী...ইয়োর কোড প্লীজ...ওভার!"

তারপর কাকাবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে ওদিককার কথা শুনে নিজে আবার বলতে লাগলেন, কী-রকম যেন অদ্ভুত ইংরেজিতে, তার মধ্যে অঙ্কের সংখ্যাই বেশি। সন্তু কিছুই মানে বুঝতে পারল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

কাকাবাবু বেশ খানিকটা সময় ধরে কথা বললেন ওয়্যারলেসে। তাঁকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। এক সময় তিনি বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, "ওভার অ্যাণ্ড আউট!" তারপর খুলে ফেললেন হেডফোন। পাইপটা ধরাতে গিয়ে লাইটার খুঁজে পেলেন না। অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "দূর ছাই, সেটা আবার রাখলুম কোথায়?"

কাকাবাবুর ওভারকোটে অন্তত দশ-এগারোটা পকেট। কখন কোন্ পকেটে তিনি কোন্ জিনিসটা রাখেন, তা নিজেই ভুলে যান। কয়েকটা পকেট হাতড়ে তিনি লাইটারটা পেয়ে গিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর কয়েকটা টান দেবার পর বললেন, "ওরা বেরিয়ে পড়েছিল...কিন্তু অত দেরি করে এলে তো চলবে না...একমাত্র উপায় যদি হেলিকপটার আসতে পারে... কিন্তু হেলিকপটার ওদের ওখানে নেই, আছে একটা নামচেবাজারে...সেখানে খবর দিয়ে যদি আনাতে পারে।"

আবার হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন। তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে আছে।

কাকাবাবু কোনওদিন কোনও অবস্থাতেই ভয় পান না। তিনি বারবার বলেন, গায়ের জোর থাক বা না থাক, মনের জোর থাকলে মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে। সন্তুর মনে পড়ল, কনিষ্কর মুণ্ডু খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল যে-বার, সেবার একটা ভয়ংকর গুহার মধ্যে পড়ে গিয়েও কাকাবাবু একটুও ঘাবড়ায়নি। আন্দামানে গিয়ে তিনি নিজে জোর করে জারোয়াদের দ্বীপে নেমেছিলেন। কোনওবার কাকাবাবুকে সে বিচলিত হতে দেখেনি।

গম্বুজের এই বিশাল লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, এটা তো আর জোর দিয়ে খোলা যাবে না। বাইরের সাহায্য দরকার। সে সাহায্য কখন আসবে কে জানে!

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা কী হচ্ছে! কারা দরজা বন্ধ করল? তুই আবার ইয়েতি দেখলি! সত্যি করে বল্ তো, ঠিক দেখেছিলি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ কাকাবাবু!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি দেখতে পেলাম না কেন? আমার দেখাই বেশি দরকার ছিল!"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "ছটা বাজে। বাইরে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে। আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে। তুই বরং এক কাজ কর সন্তু, তুই দূরবিনটা নিয়ে ওপরে জানলার কাছে বসে থাক। দ্যাখ, কোনও আলো-টালো চোখে পড়ে কি না। হেলিকপটারটা যদি আসে, সেটারও আলো দেখতে পাবি।"

সন্তু দূরবীন নিয়ে উঠে গেল ওপরে। সেখানেই বসে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝখানে একবার নীচে নেমে কিছু বিস্কুট আর চীজ খেয়ে নিল। কাকাবাবু স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করে দু'কাপ কফি বানালেন। তারপর তিনি খাটের ওপর বসে উরুর

ওপর রিভলবারটা রেখে একটা বই পড়তে লাগলেন।

সন্তু দূরবীন নিয়ে গম্বুজের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। কিছুই দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আকাশও দেখা যায় না, এরকম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে চোখ ব্যথা করে।

সেখানেই সন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না। হঠাৎ এক সময় সে রীতিমতন ব্যথা পেয়ে জেগে উঠল। তার মুখে যেন ফুটছে হাজার হাজার সূচ। সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ঠকঠক করে।

চমকে উঠতেই তার হাত থেকে দূরবীনটা খসে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে লাগল শব্দ করে।

নীচ থেকে কাকাবাবু বলে উঠলেন, "কী হল, সন্তু ?"

সন্তু তখন জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত। কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না, এত জোর হাওয়া। বাইরে দারুণ তুষারঝড় উঠেছে। গম্বুজের ভেতরটা কুচো কুচো বরফ আর হিমশীতল বাতাসে ভরে যাচ্ছে। আর বেশি হাওয়া ঢুকলে তাদের ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে।

অতি কষ্টে জানলা বন্ধ করে নীচে নেমে এল সন্তু। এমন ঠাণ্ডা লেগেছে যে তার চোয়াল দুটো যেন আটকে গেছে। অতি কষ্টে সে বলল, "কাকাবাবু, বাইরে...তু-ষা-র-ঝড়! দারুণ জো-রে!"

কাকাবাবু বললেন, "তুই আমার কাছে চলে আয় শিগগিরই!"

সন্তু কাকাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সন্তুর মুখখানা ধরে খুব জোরে দু'হাত ঘষতে লাগলেন তার গালে। একটুক্ষণ এ-রকম থাকার পর সন্তুর গাল দুটো অনেকটা গরম হয়ে গেল, চোয়ালটাও স্বাভাবিক মনে হল।

কাকাবাবু বললেন, "শিগগির স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়।"

তারপর যেন নিজের ওপরই রাগ করে বললেন, "গোদের ওপর বিষফোঁড়া! একেই এই কাণ্ড তার ওপর আবার তুষারঝড়। এই ঝড় কখন থামবে কে জানে! ঝড় না থামলে তো হেলিকপ্টার এদিকে এলেও নামতে পারবে না!"

বরফের ঝড়টা চলতে লাগল সারা রাত ধরে।

গম্বুজের ভেতরটা যেন ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ওপরের জানলাটা ভাল করে বন্ধ করা যায়নি। পুরো বন্ধ করলেও ভেতরে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্বাসের কষ্ট হবে। খোলা জানলা দিয়ে ঝড়ের হাওয়ার ঝাপটা ঢুকছে সেইজন্য একেবারে অসহ্য শীত।

সন্তুর মনে হল, আজকের রাতটা যেন কাটবে না। এরকম তীব্র বরফের ঝড় এখানে আগে আর একবারও সে দেখেনি। এখানে পৌঁছবার দিনই ব্লিজার্ড উঠেছিল, কিন্তু তা চলেছিল মাত্র দু' ঘন্টা।

শীতের জন্য সন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে গোটা শরীরটাই ঢুকিয়ে নাকটা শুধু বাইরে রেখেছে। কাকাবাবু কিন্তু বিছানার ওপর বসে আছেন সোজা হয়ে। যেন তিনি ধ্যান করছেন।

এক সময় তিনি বললেন, "তুই আর শুধু শুধু জেগে আছিস কেন, সন্তু ? তুই ঘুমো।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঘুমোবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি একটু দেখি, যদি হেলিকপ্টার

আসে। কিংবা অন্য কেউ দরজা খুলে ঢোকার চেষ্টা করলেও আমাদের তৈরি থাকতে হবে।"

সন্তুর ঘুম আসে না। সে খুব মনোযোগ দিয়ে বাইরের আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করে। যদি কোনও হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা যায়। সেই হেলিকপ্টারে আসবে তাদের উদ্ধারকারীরা। অবশ্য, হেলিকপ্টার আসবে কি না, ওয়্যারলেসে কাকাবাবুর সঙ্গে সে রকম পাকা কথা কিছু হয়নি। তাছাড়া, এ রকম ঝড়ের মধ্যে কি হেলিকপ্টার ওড়ে? উদ্ধারকারীদেরও তো প্রাণের ভয় আছে?

এক সময় রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হল। এখানে ভোরবেলা পাখি ডাকে না। আকাশে জমাট মেঘ কিংবা বরফের ঝড় থাকলে ভোরের আলোও দেখা যায় না। দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে।

ভোরের একটু আগেই ঝড় থেমেছে। ওপরের জানলার কাচে দেখা যাচ্ছে খানিকটা ফ্যাকাসে আলো। সন্তু প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করেও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। চোখ মেলেই দেখল, কাকাবাবু তাঁর খাটের ওপর ঠিক একই জায়গায় একই রকমভাবে ঠায় বসে আছেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন ক'টা বাজে, কাকাবাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "সকাল হয়ে গেছে, সাড়ে আটটা বাজে, এবার উঠে পড়। ঝড়টাও থেমে গেছে মনে হচ্ছে।"

সন্তু স্লিপিং ব্যাগের জিপ টেনে খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। হঠাৎ যেন শীত কমে গেছে অনেকখানি। দু'দিকে হাত ছড়িয়ে সে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। তখন সন্তুর মনেই নেই যে তারা গম্বুজের মধ্যে বন্দী।

কাকাবাবু বললেন, "রাত্তিরে আর কিছু হয়নি।

হেলিকপ্টারটাও এল না। কী জানি ওরা কী করছে?"

অমনি সন্তুর আবার মনে পড়ে গেল সব। তাদের কেউ উদ্ধার করতে না এলে এই গম্বুজের মধ্যে তাদের মরতে হবে। এখান থেকে বেরুবার আর কোনও উপায় নেই।

সন্তু গিয়ে বাইরের দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। সেটা আগের মতনই বন্ধ। সন্তু কিংবা কাকাবাবুর সাধ্য নেই সেটা খোলার।

কাকাবাবু বললেন, "ফ্ল্যাস্কের মধ্যে চা করে রেখেছি। দু-একটা বিস্কুট আর চা খেয়ে নে। তারপর তুই বসে বসে পাহারা দিবি। আমি ঘুমোব। অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই এখন।"

চা খাওয়ার আগেই সন্তু একবার ওপরে উঠে গেল জানলার কাছে। ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ, বাইরেটা একেবারে ধপ-ধপ করছে, এমন সাদা। নতুন বরফের ওপর রোদ পড়লে যেন আলো ঠিকরে বেরোয়। দূরের বরফঢাকা প্রান্তরকে মনে হয় আয়নার মতন। চারদিক এখন এমন সুন্দর, অথচ এর মধ্যেও যে কত রকম বিপদ রয়েছে, তা বোঝাই যায় না।

নীচে নেমে এসে সন্তু চা আর চারখানা বিস্কুট খেয়ে নিল। কিন্তু তার আরও খিদে পাচ্ছে। অথচ খাবারও বেশি নেই স্টকে। এমন বন্দী হয়ে কতদিন থাকতে হবে কে জানে! দু' তিন দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে সব খাবার।

কাকাবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন টান টান হয়ে। চোখ বুজে বললেন, "রিভলবারটা আমার পাশেই রইল। কেউ যদি আচমকা দরজা খুলে ফেলে, কোনও কথা না বলে সোজা গুলি চালাবি। পারবি তো?"

সন্তু ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্তু দরজাটার দিকে চেয়ে বসে রইল চুপ করে। কিন্তু এরকমভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়! কাল দুপুরের পর থেকেই তারা এই গম্বুজের মধ্যে বন্দী। পুরো একটা দিনও কাটেনি, তবু যেন মনে হচ্ছে কতকাল ধরে তারা এখানে আছে। সন্তু ভাবল, জেলখানায় যারা বন্দী থাকে, তাদের কী অবস্থা হয়? অবশ্য, জেলখানার বন্দীরাও অন্য মানুষজন দেখতে পায় কিংবা গলার আওয়াজ শুনতে পায়। এ জায়গাটা যে সাঙ্ঘাতিক নিস্তব্ধ, তাই সময়কেও এখানে লম্বা মনে হয়।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু তার মাকে একটা চিঠি লিখতে শুরু করল। সিয়াংবোচি থেকে মাকে শেষ চিঠি লিখেছিল সন্তু। এখান থেকে চিঠি পাঠাবার কোনও উপায় নেই। এই গম্বুজ থেকে জীবন্ত অবস্থায় বেরুতে পারবে কি না, তারও তো ঠিক নেই। তবু চিঠি লেখা যাক। কোনও-না-কোনওদিন এখানে কেউ আসবে নিশ্চয়ই, তখন চিঠিটা পেয়ে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

চিঠিখানা অর্ধেক মাত্র লেখা হয়েছে, এই সময় দরজায় দুম করে একটা শব্দ হল।

শব্দটা যত জোরে হল, সন্তুর বুকের মধ্যেও যেন তত জোরে আওয়াজ হল একটা। হাত থেকে পড়ে গেল কলমটা।

আবার দু'বার শব্দ।

সন্তু তাকিয়ে দেখল, সেই শব্দেও কাকাবাবু জাগেননি। সে টপ করে রিভলবারটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তখন বাইরে থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "এনিবডি ইনসাইড দেয়ার?"

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েই যেন সন্তুর বুকে প্রাণ ফিরে

এল। সে অসম্ভব উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'ইয়েস! উই আর হিয়ার!"

বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, "কোড নাম্বার? এনি কোড নাম্বার?"

সন্তু বলল, "ওয়েট, প্লিজ ওয়েট! আই অ্যাম কলিং মাই আংকল।"

ততক্ষণে কাকাবাবু জেগে উঠেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "বাইরে...লোক এই মাত্র এল...কী জিজ্ঞেস করছে।"

কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়াই এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এলেন দরজার কাছে। সন্তুর হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ দেয়ার?"

বাইরে থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু বললেন, "পীক নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন...ইজ দ্যাট বেস? প্লীজ ওপন দা ডোর।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপর আওয়াজ হতে লাগল দমাস দমাস করে। তারপর বাইরে থেকে ওরা কিছু বলতেই কাকাবাবু সন্তুর ঘাড় ধরে বললেন, "পিছিয়ে আয়, পিছিয়ে আয়, শিগগির..."

সন্তুরা ততক্ষণে সরে এসেছে। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ওরা গুলি করে তালা ভাঙছে! ওরা কখন এল, হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেলাম না।"

কাকাবাবু তো ঘুমিয়ে ছিলেন, সন্তু জেগে থেকেও শুনতে পায়নি। চিঠি লেখায় সে এমনই মগ্ন ছিল।

বাইরে থেকে ওরা এবার দরজাটা ঠেলছে। সন্তুর মনে পড়ল এদিক থেকেও ছিটকিনি বন্ধ। সে ছুটে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে

দিতেই দরজা খুলে গেল।

পুরো সামরিক পোশাক পরা দু'জন লোক ঢুকলেন ভেতরে। একজন নেপালি। অন্যজন ভারতীয়। দু'জনেরই হাতে ছোট মেশিনগানের মতন অস্ত্র।

নেপালি অফিসারটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু বললেন, "কারা আমাদের আটক করে রেখেছিল। আমাদের প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। অনেক গুরুতর কথা

আছে।"

সন্তু আর কিছু না শুনে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। তার এখন নাচতে ইচ্ছে করছে। সে প্রথমেই বরফের মধ্যে ডিগবাজি দিল দু'বার। তারপর দু'হাত তুলে বৈষ্ণবদের ভঙ্গিতে নাচ শুরু করল।

খানিকটা দূরে থেমে আছে একটা হেলিকপ্টার। তার সামনের পাখাটা এখনও ঘুরছে। চালকের আসনে বসে আছে একজন নেপালি।

যে-দু'জন মিলিটারি অফিসার গম্বুজের মধ্যে ঢুকেছেন, তাঁদের একজন নেপাল সরকারের প্রতিনিধি, অন্যজন ভারত সরকারের। একজনের নাম জং বাহাদুর রানা, অন্যজন গুরুদত্ত ভার্মা। দু'জনেই কাকাবাবুর দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর রানা বললেন, "আপনার কিছু হয়নি তো, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা যে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, সে জন্য আমরা আনন্দিত। কী হয়েছিল বলুন তো ব্যাপারটা।"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, অনেকটা সময় লাগবে। সত্যিই আপনারা ঠিক সময় এসেছেন। আসুন, বসা যাক।"

ভার্মা বললেন, "বাইরের লোকটি কে ?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরের লোক ? বাইরের আবার কোন্ লোক ? আর তো কেউ ছিল না ?"

ভার্মা বললেন, "ওই লোকটাই কি তাহলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ? কিন্তু বেচারি নিজেই শেষটায়—"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না তো ? চলুন তো দেখি বাইরের কোন লোক ?"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

গম্বুজের দরজাটা খোলার পর বাইরে যে জায়গাটা দরজায় ঢাকা পড়ে গেছে, সেখানে বরফের মধ্যে টানটান হয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকটি একজন চীনা, বছর পঁয়তিরিশের মতন বয়েস, পরনে প্যান্টশার্ট। কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে বসে দেহটা উল্টে দিলেন। কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। লোকটির মৃত্যু হল কী ভাবে ? অবশ্য বরফের ঝড়ের মধ্যে সারারাত বাইরে থাকলে কারুর পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়।

রানা বললেন, "ওই লোকটি বোধ হয় গম্বুজে আশ্রয় নিতে এসেছিল। আপনারা দরজায় যে ধাক্কার শব্দ শুনেছেন, সেটা এরই।"

ভার্মা বললেন, "তা হলে দরজাটা বন্ধ করল কে ?"

রানা বললেন, "তা হলে এই লোকটিই কি দরজা বন্ধ করতে এসেছিল, তারপর ব্লিজার্ডের মুখে পড়ে আর ফিরতে পারেনি ?"

ভার্মা বললেন, "একজন চীনা এখানে আসবে কী করে ? আর গম্বুজের দরজাটাই বা বন্ধ করবে কেন ?"

কাকাবাবু ততক্ষণে মন দিয়ে মৃত লোকটির শরীর পরীক্ষা করছেন। চেষ্টা করছেন লোকটির হাতের কনুই এবং পায়ের হাঁটুর কাছে মোড়বার। কিন্তু লোকটির শরীর একেবারে শক্ত। কাকাবাবুর খানিকটা ডাক্তারি বিদ্যেও আছে। তিনি অবাকভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

খানিকবাদে মুখ তুলে তিনি বললেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার !"

রানা এবং ভার্মা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল আমরা গম্বুজের মধ্যে ঢুকেছি দুপুরের দিকে। এখনও চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি। কিন্তু আমি যে-টুকু ডাক্তারি জানি, তাতে বলতে পারি যে, এই লোকটির মৃত্যু হয়েছে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে। রাইগর মর্টিস অনেক আগেই সেট করে গেছে ! তাহলে এই লোকটি এখানে এল কী করে ?"

রানা বললেন, "বলেন কী, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ? তাহলে কাল আপনারা একে দেখেননি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। শুধু তো আমি একা নই, কাল দুপুর পর্যন্ত এখানে শেরপা আর মালবাহকরাও ছিল। কেউ দেখেনি। এখানে ফাঁকা জায়গায় কোনও লোক লুকিয়েও থাকতে পারে

না।"

ভার্মা বললেন, "এ যে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আপনার তাহলে নিশ্চয়ই কোনও ভুল হচ্ছে, মিঃ রায়চৌধুরী!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতে পারে। কী ভাবে লোকটি এখানে এল তা আমি জানি না। তবে, এই লোকটি যে কাল রাতে বা আজ সকালে মারা যায়নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। দু'দিন কেন তিন-চারদিন আগেও এর মৃত্যু হতে পারে!"

সন্তু হেলিকপ্টারটা দেখবার জন্য ওই দিকে যাচ্ছিল মনের আনন্দে। একবার পেছন ফিরে দেখল, কাকাবাবু আর অন্য দু'জন লোকই গম্বুজের বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন। অমনি তার কৌতূহল হল। সে আবার ফিরে এল গম্বুজের দিকে।

কাছাকাছি এসে সে থমকে গেল। একটি সম্পূর্ণ অচেনা লোকের মৃতদেহ। মুখটা হাঁ করা, চোখ দুটো খোলা। যেন সন্তুর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সন্তুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এ কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরাও তো সেই কথাই ভাবছি!"

চোখের সামনে একজন মরা মানুষকে দেখে সন্তুর শরীরটা ঘুলিয়ে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

চীনা ভদ্রলোকটির গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট।

থুতনিতে অল্প-অল্প দাড়ি। চোখ দুটি খোলা। দৃষ্টিতে ভয়ের বদলে যেন খানিকটা বিস্ময়ের ভাব মাখানো।

সন্তু মৃতদেহটির দিকে তাকাতে চায় না, কিন্তু কাকাবাবুদের কথাবার্তা শোনার জন্যও দারুণ কৌতূহল। সে কাকাবাবুর পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "এই চীনা ভদ্রলোকটি কোথা থেকে এখানে এলেন, তা কিছুই বোঝা গেল না। অথচ আমরা এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে পারি না। অনেক কাজ আছে।"

ভার্মা বললেন, "এই মৃতদেহটি কি এখানেই পড়ে থাকবে? একে এখানেই কবর দিয়ে দেওয়া হোক। চীনেরা মৃতদেহ পোড়ায় না, কবরই দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে চটপট বরফ খুঁড়ে ফেলা যাক। সন্তু গাঁইতিটা নিয়ে আয় তো!"

জং বাহাদুর রানা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, একটা কথা আছে। এই চীনা ভদ্রলোক একজন বিদেশি, এর গায়ে যে কোটটা আছে, সে-রকম কোট আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ইনি এখানে কী করে এলেন, তা জানা আমাদের সরকারের কর্তব্য। এঁর মৃত্যুর কারণটা জানা দরকার। এই দেহ পোস্টমর্টেম করতে হবে।"

ভার্মা বললেন, "তার মানে এই দেহটা এখন কাঠমাণ্ডুতে পাঠাতে হবে?"

রানা বললেন, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এদিকে কোনও চীনা অভিযাত্রী দল কি এসেছিল শিগগির?"

ভার্মা বললেন, "না তো!"

রানা বললেন, "এভারেস্টের দিকে একটি চীনা অভিযাত্রী দল

গিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, আড়াই কিংবা তিন বছর হবে।"

"সে দলের কেউ কি হারিয়ে গিয়েছিল?"

"সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। তবে চারনম্বর ক্যাম্পের কাছে দু'জন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল, একথা জানি। সে জায়গা তো এখান থেকে অনেক দূরে।"

"যদি ধরা যায় সেই দলেরই কেউ হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা দুর্ঘটনায় পড়েও কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, তবু তার পক্ষে এখানে একা-একা এতদিন বেঁচে থাকা কী করে সম্ভব?"

"কিংবা হয়তো মৃত্যু হয়েছিল তখনই, বরফের তলায় চাপা পড়ে শরীরটা এরকম অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।"

কাকাবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "তারপর ইয়েতিরা কাল রাত্রে বরফ খুঁড়ে মৃতদেহটা বার করেছে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য!"

ভার্মা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি দেখছি ইয়েতিদের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস করেন না! অথচ, আপনি নিজেই ইয়েতির দাঁত সঙ্গে করে এনেছেন!

কাকাবাবু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, "হুঁ!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাই হোক, এবারে যা ব্যবস্থা করার করুন। সময় নষ্ট করে তো লাভ নেই।"

রানা আর ভার্মা দু'জনে ধরাধরি করে মৃতদেহটা তুলল। সন্তুও হাত লাগাল। তারপর ওরা চলে এল হেলিকপটারের কাছে।

কাকাবাবু খানিকটা আফশোষের সুরে বললেন, "মৃতদেহটা তো এই হেলিকপটারেই পাঠাতে হবে। অথচ এখন হেলিকপটারটা আমাদের খুব কাজে লাগত।"

রানা বললেন, "ঘণ্টা দু'-একের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পারবে। কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত যাবে না, সিয়াংবোচি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে

এলেই চলবে। তারপর ওরা ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সঙ্গে খাবার-দাবার কিছু আছে? কাল দুপুর থেকে আমাদের ভাল করে কিছু খাওয়া হয়নি। দেখুন না, এই ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে।"

রানা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক খাবার আছে। কিন্তু আমি একটা প্রস্তাব দেব? আমাদেরও আর এখানে থাকবার দরকার কী? আমরা সবাই তো এই হেলিকপটারে ফিরে গেলে পারি।"

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন রানাসাহেব?"

রানা হাসতে হাসতে বললেন, "কেন, পাগল হবার মতন কী করলুম?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা কাজ করতে এসেছি, সেটা শেষ না করে ফিরে যাব? তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? তা হলে লেখাপড়া শিখেছি কেন? যদি ইচ্ছে হয়, আপনারা চলে যান, আমি থাকব।"

সেই মুহূর্তে কাকাবাবুর জন্য খুব গর্ব হল সন্তুর। সে জানে, তার কাকাবাবু ছাড়া এরকম কথা জোর দিয়ে আর কেউ বলতে পারে না।

ভার্মা বললেন, "রানাসাহেব, আপনি মিঃ রায়চৌধুরীকে তো ভাল করে চেনেন না, তাই ওকথা বললেন। উনি কোনও একটা কাজ শুরু করে তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। সে কাজ যত বিপজ্জনকই হোক না কেন! দারুণ গোঁয়ার লোক! আন্দামানে জারোয়াদের দ্বীপের কাছাকাছি কোনও মানুষ ভয়ে যায় না। উনি নিজে জোর করে সেখানে নেমেছিলেন!"

রানা বললেন, "কিন্তু উনি কী কাজের জন্য এখানে এসেছেন সেটাই তো আমরা ভাল করে জানি না।"

কাকাবাবু বললেন "বলছি। আগে খাবার বার করুন।"

হেলিকপটারে একটা ত্রিপল ছিল। সেটাকে ভাঁজ করে পাতা হল বরফের ওপর। তারপর নামানো হল অনেকগুলো সসেজ, হ্যামবার্গার, স্যান্ডউইচ আর দুটো ফ্লাস্কভর্তি গরম কফি।

সুন্দর রোদ উঠেছে আজ। আকাশ ঝকঝকে নীল। কে বলবে যে কালকেই সারা রাত এখানে তুষারের ঝড় বয়ে গেছে। রোদ্দুরের স্পর্শে দারুণ আরাম লাগছে এখন।

রানা হেলিকপটার-চালককে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। মৃতদেহটি নিয়ে হেলিকপটার উড়ে চলে গেল। তারপর তেরপলের ওপর গোল হয়ে বসে ওরা খাওয়া শুরু করল।

রানা বললেন, "ধরা যাক, এখানে ইয়েটি আছে। কিন্তু সে-জন্য তো পরে আরও অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে আসা যায়। আমরা তিনজনে মিলে খোঁজার চেষ্টা করাটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে না?"

সন্তু বসে আছে রানার পাশেই। সে মুখ তুলে ওঁর দিকে তাকাল।

রানা সন্তুর ঘাড়ে চাপড় মেরে বললেন, "দুঃখিত, দুঃখিত। তিনজন নয়, চারজন। আমাদের এই কিশোর বন্ধুটিও যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু এই চারজনে মিলেই বা কী করব?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার কথা-মতন আমিও বলছি, ধরা যাক, এখানে ইয়েতি আছে। আমি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছি, তার ছবিও তুলেছি। আর আমার এই ভাইপো সন্তু শপথ করে বলেছে যে সে ইয়েতির মতন অতিকায় কোনও প্রাণী এক পলকের জন্য দেখেছে। শেরপা আর কুলিরা তো সেই দেখেই পালাল। তা হলে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু—"

ভার্মা কাকাবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "আচ্ছা, মিঃ

রায়চৌধুরী, ওই শেরপা আর কুলিরাই আপনাদের গম্বুজের মধ্যে আটকে রেখে দরজা ওই রকমভাবে বন্ধ করে দিয়ে যায়নি তো?"

সন্তু বলল, "না, তা হতে পারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপা আর কুলিরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল।"

"যদি তারা আবার ফিরে আসে। আসতেও তো পারে।"

"কিন্তু আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওদের কী লাভ?"

"লাভ নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের ফেলে রেখে ওরা পালিয়েছে, সে-জন্য নেপাল সরকারের কাছ থেকে ওদের নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আপনাদের মেরে ফেলতে পারলে পরে ওরা বলতে পারে যে আপনারা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সেইজন্যই ওরা ফিরে গেছে।"

রানা বললেন, "শেরপারা খুব বিশ্বাসী হয়। তারা এরকম কাজ কক্ষনো করে না।"

সন্তু বলল, "মিংমা আমায় খুব ভালবাসত। সে কক্ষনো আমাদের মারতে চাইবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপারা যদি গম্বুজের দরজা বন্ধ করেও দেয়, তবু চীনে লোকটা কোথা থেকে এল? তাকে নিশ্চয়ই শেরপারা আনেনি।"

রানা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সত্যিই ইয়েটি দেখেছ?"

সন্তু বললো, "হ্যাঁ।"

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই সচকিতভাবে দূরের কালাপাথর পাহাড়টার দিকে একবার তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "যা বলছিলাম...ধরে নেওয়া যাক, ইয়েতি আছে। এখন দিনের বেলা, আপনাদের দু' জনের কাছেই আছে এল এম জি, আমার কাছে আছে রিভলবার। পৃথিবীতে অন্য

কোনও প্রাণী দাঁত, নখ ছাড়া আর কিছু অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না। সুতরাং আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তা ছাড়া, আমি মনে করি, মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কোনও প্রাণী পৃথিবীতে থাকতে পারে না। এতকাল ধরে ইয়েতির কথা শোনা যাচ্ছে, অথচ কোনও সভ্য মানুষ একটাও ইয়েতিকে ধরতে পারেনি, এমনকী একটা ছবিও তুলতে পারেনি কেন ? ইয়েতি কি এতই বুদ্ধিমান ? সেটাই আমাদের দেখা দরকার।"

রানা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, এই রহস্যের সন্ধানের জন্যই কি আপনি এখানে এসেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা কেইন শিপটনের কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের দাঁতের চেয়েও খুব বড় একটা দাঁত, ধরা যাক ইয়েতির দাঁত, সে সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। সেই কেইন শিপটন এখানে এসে ইয়েতি দেখতে পেয়েছিল। অন্তত সে কথা সে তার ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছে। তারপর কেইন শিপটন এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কি ইয়েতি ধরে নিয়ে গেছে ? ইয়েতি কি মানুষ খায় ? কেইন শিপটনের হাড়গোড়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

রানা বললেন, "অনেক খুঁজে দেখা হয়েছে। উনি সত্যিই যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কেইন শিপটনের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে ইয়েতির কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার।"

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও কি সেই জন্য একটা ইয়েতির দাঁত নিয়ে এসেছেন ? যদি আপনিও অদৃশ্য হয়ে যান ?"

কাকাবাবু এতক্ষণ বাদে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কী, আমি সেইজন্যই এখানে এসেছি। আমি

অদৃশ্য হবার বিদ্যেটা শিখতে চাই।"

রানা বললেন, "তা হলে এখন আপনি কী করতে চান ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সবাই মিলে এক্ষুনি কালাপাথরের দিকে এগোই না !"

রানা বললেন, "হেলিকপটারটা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না ? ঘন্টা দু' একের মধ্যেই তো ফিরে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হেলিকপটারে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। অবশ্য হেলিকপটারটা আমাদের কাজে লাগবে পরে। চলুন, আমরা নিজেরাই হেঁটে যাই, অন্তত সন্তু যেখানে ইয়েতি দেখেছিল সেই পর্যন্ত। দিনের আলো অনেকক্ষণ থাকবে।"

ভার্মা বললেন, "চলুন তা হলে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু নিজেই আগে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, "কেইন শিপটন যে দলের সঙ্গে এসেছিল, তারপর আর কোনও অভিযাত্রী দল এই পথ দিয়ে এভারেস্টের দিকে যায়নি। আর একটি জাপানি দল এসেছিল, তারা এই জায়গা থেকে ফিরে যায়। কী যেন একটা রহস্যময় অসুখ হয়েছিল তাদের।"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "খাবারের পাত্র আর কফির ফ্লাস্ক দুটো এখানেই থাক তা হলে !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এখানে তো চোরের ভয় নেই। আর, আশা করি ইয়েতিরা কাপ ডিশ কিংবা ফ্লাস্ক ব্যবহার করে না।"

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু, ওই দেখো !"

সকলে একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

গম্বুজটার পাশ দিয়ে নীল কোট পরা একজন লোক এই দিকে হেঁটে আসছে।

রানা আর ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লাইট মেশিন গান দুটি তুলে

ধরলেন লোকটির দিকে। কাকাবাবুও রিভলবারটা বার করলেন।

সন্তুই আবার হাত তুলে বলল, "মারবেন না, মারবেন না!"

নীল কোট পরা লোকটা দু'হাত তুলে তুলে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ঠিক ছুটতে পারছে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে বরফের ওপর দিয়ে। রানা আর ভার্মা লাইট মেশিনগান উঁচিয়ে আছেন লোকটির দিকে।

একটু কাছে আসতেই দেখা গেল, লোকটা মিংমা।

কাকাবাবু বললেন, "এ তো আমাদের একজন শেরপা!"

সন্তু বলল, "আমি আগেই চিনতে পেরেছিলাম।"

মিংমা কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল, "সাব!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? রাস্তায় তোমাদের কোনও বিপদ ঘটেছে? ফিরে এলে কেন?"

মিংমা বলল, "সাব, আমি মাফি মাঙতে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর আমার দিলের মধ্যে বহুত দুখ্ হচ্ছিল। আমি জবান দিয়েছিলাম আপনাদের সঙ্গে যাব, শেরপা কখনও জবান নষ্ট করে না, কখনও ভয় পায় না।"

জং বাহাদুর রানা মিংমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে নেপালি ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবার কেন ফিরে এসেছ, সত্যি করে বলো? যদি কোনও মতলব থাকে—"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, এখানে আর

কোনও নাটক করার দরকার নেই। মিংমা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও? তুমি না যেতে চাইলেও আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। আর যদি যেতে চাও তো আসতে পার।"

মিংমা বলল, "সাব, আমি আর আপনাদের সঙ্গ ছাড়ব না। আপনাদের জন্য আমি জান্ দিতেও তৈয়ার। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর, আজ সকালে আমার মন বলল, ওরে মিংমা, তুই এ কী করলি? একজন খোঁড়া বাঙ্গালী ভয় পেল না, আর তুই শেরপার বাচ্চা হয়ে জানের ডরে ভেগে এলি? ছিয়া ছিয়া ছিয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি কথায় সময় নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। চলো, তাহলে এগোনো যাক!"

মিংমা কাকাবাবুর কাঁধের হ্যাভারস্যাকটা প্রায় জোর করেই নিজে নিয়ে নিল। তারপর বলল, "আংকল সাব, আপনার যদি হাঁটতে কষ্ট হয়, তা হলে এই মিংমা আপনাকে কাঁধে করেও নিয়ে যেতে পারে।"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "আবার বেশি কথা বলছ! এগোও! তোমরা সামনে সামনে চলো।"

মিংমাকে পেয়ে সন্তু খুব খুশি। মিংমার মতন হাসিখুশি, ছটফটে মানুষটি যে ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে পালাবে, এটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সে মিংমার পাশে-পাশে চলতে-চলতে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কতদূর চলে গিয়েছিলে?"

মিংমা বলল, "সে-কথা থাক, সন্তু সাব। ও কথা ভাবতেই আমার সরম্ লাগছে। কাল রাতে তোমাদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দারুণ বিপদ! কারা যেন আমাদের গম্বুজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বাইরে থেকে।"

মিংমা দারুণ অবাক হয়ে বলল, "সে কী ? এখানে কে দরজা বন্ধ করবে ? আপনা আপনি দরজা টাইট হয়ে যায়নি তো ?"

জং বাহাদুর রানা জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে থেকে লোহার পাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। ইয়েটি তো এরকমভাবে দরজা বন্ধ করতে পারে না ! তা হলে কে করেছিল ? তোমরা করনি তো ?"

মিংমা চোখ গোল গোল করে বলল, "আমরা ? কেন, আমরা দরজা বন্ধ করব ?"

রানা বললেন, "সাহেবদের মেরে ফেলতে পারলেই তো তোমাদের সুবিধে ছিল ! তা হলে আর কেউ তোমাদের নামে দোষ দিতে পারত না ?"

মিংমা বলল, "আমি পশুপতিনাথজীর নামে কিরিয়া কেটে বলছি, ওরকম কাজ আমরা কক্ষনো করি না। তাছাড়া, কাল রাতে আমরা বহুত দূরে ছিলাম !"

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি সত্যিই ইয়েতি দেখেছ ?"

মিংমা বলল, "ইয়েটি ছিল কিংবা আউর কুছ ছিল, কেয়া মালুম ! লেকিন একটা বহুত বড়া জানোয়ারকা মাফিক কুছ দেখা !"

"ঠিক কোন্ জায়গাটায় দেখেছিলে ?"

"ওই যে সামনে কালাপাথ্থর নামে পাহাড়টা দেখছেন, ঠিক ওর নজদিগে !"

"আমাদের সেই জায়গাটা দেখাতে পারবে ?"

"হাঁ সাব !"

"আমরা তা হলে এখন ওই জায়গাটা পর্যন্ত যাব ! কী বলেন, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, দূর থেকে বললেন,

"হ্যাঁ। আপনারা এগিয়ে যান।"

ভার্মা বললেন, "আমরা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছি আপনার জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমি ঠিক ধরে ফেলব আপনাদের। জানেন তো, স্লো অ্যান্ড স্টেডি, উইনস দা রেস !"

রানা বললেন, "তা ঠিক। আপনার বেশি কষ্ট করার দরকার নেই, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আস্তে-আস্তে আসুন !"

কাল সারা রাত তুষারপাতের জন্য খুব পাতলা ঝুরো-ঝুরো বরফ জমে আছে চারদিকে। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো গেঁথে যাচ্ছে সেই বরফে। সেই জন্য হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু নিজের অসুবিধের কথা কারুকে জানতে দিতে চান না তিনি।

রোদ্দুরের তাপে এক-এক জায়গায় বরফ গলে জল হয়ে আছে। সেখানে যে-কোনও মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। জং বাহাদুর রানা একবার আছাড় খেয়ে পড়তেই মিংমা গিয়ে তাঁকে টেনে তুলল। তারপরই পড়লেন ভার্মা। কাকাবাবু কিন্তু একবারও আছাড় খেলেন না। সকলের থেকে খানিকটা পেছনে তিনি আসতে লাগলেন খুব সাবধানে, পা টিপে-টিপে।

সন্তু পাতলা শরীর নিয়ে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আকাশ আজ খুবই পরিষ্কার। এই রকম দিনে এভারেস্টের চূড়া দেখা যায়। কালাপাথর পাহাড়টার জন্য এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে। সন্তু এখানে এসে কয়েকবার এভারেস্টের চূড়া দেখেছে, তার নিজের ক্যামেরায় ছবিও তুলেছে। তবু আর-একবার দেখতে পাবে বলে উত্তেজনা জাগছে তার শরীরে। বিশাল মহান কিছুর কাছাকাছি এলেই মানুষ একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

মিংমা পেছন থেকে এসে সন্তুর হাত চেপে ধরে বলল, "সন্তু

সাব, অত সামনে-সামনে যেও না ! ওই দুই বড়া সাবদের আগে যেতে দাও।"

সন্তু বলল, "কেন ?"

"যদি ইয়েটি এসে তোমাকে আগে ধরে নিয়ে যায় ?"

সন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। এর মধ্যে ইয়েতির কথা সে ভুলে গিয়েছিল। আবার মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে উঠল তার বুক।

জোর করে সাহস এনে সে বলল, "দু'খানা এল এম জি আছে আমাদের সঙ্গে। ইয়েতি কী করবে ?"

মিংমা ফিসফিস করে বলল, "সন্তু সাব, ইয়েটি ভ্যানিশ করে নিয়ে যেতে পারে !"

সন্তু খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, "যাঃ !"

"আমিও আগে মানতাম না। লেকিন নিজের আঁখসে তো দেখলাম কাল। এক্ দো সেকেন্ড ছিল, তারপরই ভ্যানিশ করে গেল। কেয়া ঠিক নেহি !"

সন্তু বলল, "হুঁ !"

সন্তু সেই কালো-মতন বিরাট প্রাণীটাকে এক পলকের জন্য দেখেই ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর যখন আবার তাকিয়েছে, সেটা আর নেই। অত তাড়াতাড়ি কোথায় পালাল ? সত্যি কি কোনও প্রাণী অদৃশ্য হতে পারে ?

মিংমা সন্তুকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল। ভার্মা আর রানা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন, ওঁরা এগিয়ে এলেন। সন্তুর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু রানা আর ভার্মার অসুবিধে হচ্ছে বেশ। একবার করে আছাড় খেয়ে ওঁরা বেশি সাবধান হয়ে গেলেন। দু' জনের হাতেই লাইট মেশিনগান, নামে লাইট হলেও খুব হালকা তো নয় !

ভার্মা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! এখানেই ইয়েতি দেখেছিলে নাকি?"

সন্তু বলল, "না, আরও অনেক দূর আছে।"

"আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলো। যদি সত্যিই ইয়েতি দেখতে পাই, গুলিতে তাকে একেবারে ফুঁড়ে দেব! জ্যান্ত হোক, মরা হোক, একটা ইয়েতি নিয়ে যদি দেখাতে পারি, তা হলে সারা পৃথিবীতে আমাদের নাম ছড়িয়ে যাবে! এ পর্যন্ত কেউ ইয়েতির অস্তিত্ব ঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারেনি!"

রানা বললেন, "এই ছেলেটি নিজের চোখে দেখেছে, একে অবিশ্বাসই বা করা যায় কী করে! শেরপা কিংবা কুলিদের না হয় কুসংস্কার থাকতে পারে—"

ভার্মা বললেন, "আর এক যদি কোনও ভাল্লুক-টাল্লুকের মতন জানোয়ার দেখে থাকে-"

রানা বললেন, "এখানে ভাল্লুক আসবে কোথা থেকে? এ পথ দিয়ে কত অভিযাত্রী গেছে, কেউ কোনও দিন কোনও ভাল্লুক দেখেনি।"

ভার্মা বললেন, "কেউ তো আগে ইয়েতিও দেখেনি!"

রানা বললেন, "কেইন শিপটন দেখেছিলেন। অন্তত তাঁর ডায়েরিতে সেই কথা লেখা আছে। আমার মনে হয়, তিব্বতের দিক থেকে ইয়েটিই হোক বা অন্য কোনও বড় জানোয়ারই হোক, এদিকে ছিটকে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুও পায়ের ছাপ দেখেছেন। মোটেই ভাল্লুকের মতন নয়, মানুষের মতন। তবে, চারটি আঙুল।"

ভার্মা বললেন, "তাও বটে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ভার্মা সাহেব, আপনি এরকম ভাল বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?"

ভার্মা হেসে বললেন, "আমি তো কলকাতায় লেখা-পড়া করেছি। আমি থাকতুম হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে। তোমাদের বাড়ি তো ভবানীপুর, তাই না? সে জায়গাও চিনি।"

রানা বললেন, "আমি পড়েছি দার্জিলিঙের নর্থ পয়েন্ট স্কুলে। আমার অনেক বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আমি দু' তিনবার থেকেছি।"

মিংমা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সাব, দেখিয়ে।"

তিনজনেই চমকে গিয়ে মিংমার দিকে তাকাল। মিংমা সামনে বরফের মধ্যে এক জায়গার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আছে।

সেখানে একটা মস্ত বড় পায়ের ছাপ।

ভার্মা আর রানা সেখানে বসে পড়লেন। সন্তু পেছন ফিরে কাকাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাকাবাবুকে দেখতে পেল না।

ভার্মা বলল, "একটা মাত্র পায়ের ছাপ? নিশ্চয়ই টাটকা, কারণ কাল রাত্তিরে তুষারপাত হয়েছিল, তার আগের হলে মিলিয়ে যেত!"

রানা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক এখানে। আরে—, মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ভার্মা বললেন, "কোথাও বসে বিশ্রাম করছেন বোধহয়।"

সন্তু বলল, "বরফ তো উঁচু-নিচু নয়, কোথাও বসলেই বা দেখতে পাব না কেন? বেশি দূরে তো ছিল না!"

ভার্মা বললেন, "হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি তো? ফিরে গিয়ে আমাদের দেখা দরকার।"

রানা বললেন, "কিন্তু এখানে হঠাৎ এই একটা পায়ের ছাপ এল কী করে?"

তিনি এল এম জি-টা উঁচিয়ে একবার চারদিকে ঘুরে তাকালেন।

মিংমা খুব জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, "আংকল সাব! আংকল সাব!"

কোনও উত্তর এল না।

সন্তু বলল, "আমি কাকাবাবুকে খুঁজে আসছি!"

ভার্মা বললেন, "আমি আর মিঃ রানা এখানে থাকছি, তুমি আর মিংমা দেখে এসো। উনি আহত হয়ে থাকলে আমাদের ডেকো।"

সন্তু মাঝে-মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে কাকাবাবুর প্রতি লক্ষ রাখছিল। কাকাবাবু কখনও চোখের আড়াল হননি। দুশো আড়াই শো গজ দূরে ঠুক-ঠুক করে আসছিলেন। ভার্মা আর রানার সঙ্গে কথা বলার সময় সন্তু কাকাবাবুর দিকে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল। এরই মধ্যে কাকাবাবু কোথায় গেলেন!

খানিকটা ফিরে এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সন্তু প্রায় কেঁদে উঠে বলল, "মিংমা!"

মিংমাও একই সঙ্গে দেখতে পেয়েছে।

বরফের ওপরে পড়ে আছে কাকাবাবুর একটা ক্রাচ আর খানিকটা টাটকা রক্ত। আর কিছু না।

ভার্মার মুখ দেখে মনে হল, জীবনে তিনি এ-রকম অবাক কখনও হননি। চোখ দুটো একেবারে স্থির হয়ে গেছে। ফিসফিস

করে তিনি বললেন, "এ কী ব্যাপার? মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন?"

রানা বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এই তো আমাদের পেছনেই ছিলেন, খানিকটা আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম! কোনও কারণে উনি কি গম্বুজে ফিরে গেলেন?"

ভার্মা বললেন, "তা কী করে হবে? এত তাড়াতাড়ি উনি কী করে ফিরে যাবেন? উনি কি দৌড়তে পারেন? তাছাড়া আমাদের না বলে যাবেনই বা কেন?"

ভার্মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বরফের ওপর পড়ে থাকা ক্রাচটার দিকে।

রানা বললেন, "উনি ক্রাচ ছাড়া হাঁটবেনই বা কী করে? ওখানে রক্তই বা পড়ে আছে কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না যে!"

সন্তুও এত অবাক হয়ে গেছে যে, কোনও কথা বলতে পারছে না। বিশেষত রক্ত দেখে তার বুকটা কাঁপছে।

মিংমা হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে উঠল, "আংকল সাব! আংকল সাব!"

জায়গাটা এমনই নিস্তব্ধ যে, মিংমার চিৎকারে যেন এই স্তব্ধতা ফেটে একেবারে ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল। বহু দূরে প্রতিধ্বনি, যেন তিনদিক থেকে মিংমাকে ভেংচিয়ে কেউ বলতে লাগল, আংকল সাব!

মিংমা আরও দু'বার ডাকতেই রানা বললেন, "থাক, আর চিৎকার করতে হবে না। মিঃ রায়চৌধুরী কী আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন নাকি?"

ভার্মা বললেন, "ইয়েতি অদৃশ্য হতে পারে, এ-কথা আমিও শুনেছি। কোনও ইয়েতি এসে যদি মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে

যায়...”

রানা বললেন, “ইয়েটি ? আপনিও ইয়েটিতে বিশ্বাস করেন ?”

ভার্মা বললেন, “তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে বলুন ? এই জন্যই আমি তখন মিঃ রায়চৌধুরীকে বলেছিলাম, মাত্র এই ক'জন লোক নিয়ে এখন কালাপাথরের দিকে যাবার দরকার নেই।”

মিংমা এই সময় বরফের ওপর শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো আস্তে আস্তে এগোতে লাগল কাকাবাবুর ক্রাচটার দিকে।

ভার্মা বললেন, “ও কী ? ও-রকম করছে কেন ?”

রানা বললেন, “ও দেখতে চাইছে, ওখানে কোনও ক্রিভাস আছে কিনা। একমাত্র চোরা কোনও ক্রিভাসের মধ্যে পা দিয়ে মিঃ রায়চৌধুরী নীচে ডুবে যেতে পারেন।”

ভার্মা যেন নিজের অজান্তেই ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, “আমরাও তো ওইখান দিয়েই এসেছি!”

রানা বললেন, “অনেক সময় ছোট-ছোট ক্রিভাস থাকে, ঠিক সেটার ওপর পা দিলেই বিপদ! মিংমা ঠিক কাজই করেছে, শুয়ে থাকলে হঠাৎ তলিয়ে যাবার ভয় থাকে না।”

সন্তু বলল, “রক্ত! ওখানে রক্ত কী করে আসবে ? বরফের ওপর পড়ে গেলে তো বেশি জোর লাগে না ? রক্তও বেরোবে না।”

ভার্মা বললেন, “ঠিক বলেছ সন্তু, রক্ত কী করে এল ?”

মিংমা একটু-একটু করে এগিয়ে গিয়ে ক্রাচটাকে ধরে ফেলল। তারপর বরফের ওপর চাপড় মারতে লাগল জোরে জোরে। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছিটকাতে লাগল সেই আঘাতে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সেখানকার বরফের মধ্যে কোনও গর্ত-টর্ত নেই।

মিংমা আশেপাশের খানিকটা জায়গাও চাপড়ে দেখল ওই একরকমভাবে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিরাশ গলায় বলল, “নেহি সাব! ইধার কিরভাস নেহি!”

রানা বললেন, “আশ্চর্য! একটা মানুষ কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?”

ভার্মা বললেন, “ব্যাপারটা মোটেই আমার ভাল ঠেকছে না। আমাদের আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়।”

রানা বললেন, “আমরা কি ফিরে যাব বলতে চান ? মিঃ রায়চৌধুরীর খোঁজ না করেই ? ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বিশেষ রিকোয়েস্ট আছে, যাতে আমরা ওঁর নিরাপত্তার ভার নিই।”

ভার্মা বললেন, “আর কীভাবে খোঁজ করবেন ? চারদিকে ধূ-ধূ করছে বরফ। এখানে কোনও মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর মিঃ রায়চৌধুরীর মতন একজন খোঁড়া লোক দৌড়েও কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাহলে তিনি গেলেন কোথায় ?”

রানা বললেন, “সেটাই তো প্রশ্ন। তিনি গেলেন কোথায় ? একটা না একটা ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে!”

ভার্মা বললেন, “দেখুন, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের সেই লাইনটা আমার মনে পড়ছে। ‘দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভন অ্যান্ড আর্থ, হোরিশিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অব ইন ইওর ফিলসফি!’ আপনারা যা-ই বলুন, বাতাসে মাটিতে এখনও এমন রহস্য আছে, যা মানুষের অজানা!”

রানা বললেন, “সে কী, মিঃ ভার্মা! আপনি কি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন নাকি ?”

এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ভার্মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বরফের ওপর। তারপর হাতজোড় করে কী যেন মন্ত্র পড়তে

লাগলেন।

একটু বাদে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার ভীষণ শীত করছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। চলুন, গম্বুজটার কাছে ফিরে যাই।"

রানা কী-রকম যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আপন মনে বললেন, "গম্বুজের কাছে ফিরে যাব? মিঃ রায়চৌধুরীর কী হবে?"

ভার্মা বললেন, "গম্বুজের কাছে ফিরে গিয়ে দেখা যাক। কোনও কারণে বা যে-কোনও উপায়ে উনি তো সেখানে যেতেও পারেন। হয়তো কোনও দরকারি জিনিস ফেলে এসেছিলেন।"

রানা বললেন, "গম্বুজটা কত দূরে! উনি অতদূরে ফিরে গেলেন, আর আমরা টেরও পেলাম না?"

ভার্মা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "উনি আমাদের সামনে কোথাও যাননি, এ কথা তো ঠিক? ওঁকে খুঁজতে হলে আমাদের পেছনের দিকেই খুঁজতে হবে। আমার অসম্ভব শীত করছে। পা দুটো যেন জমে যাচ্ছে একেবারে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমিও মরে যাব!"

সন্তু রানার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

রানা বললেন, "কী?"

ভার্মা বললেন, "চলো, গম্বুজের মধ্যে চলো, সেখানে বসে তোমার কথা শুনব।"

সন্তু বলল, "আমি একবার একটা ক্রিভাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম! ওই মিংমা আমায় টেনে তুলেছিল।"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব!"

সন্তু বলল, "আমি অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলাম বরফের

মধ্যে। তারপর...একটা অদ্ভুত জিনিস মনে হয়েছিল। আমার পা কিসে যেন ঠেকে গেল। একটা শক্ত কিছুতে। আমার ধারণা, সেটা একটা লোহার পাত।"

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

সন্তু বলল, "লোহার পাত।"

ভার্মা ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, "বরফের নীচে লোহার পাত? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?"

রানা আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে বুঝলে লোহার পাত? পাথরও তো হতে পারে। বরফের খানিকটা নীচে তো পাথর থাকবেই!"

সন্তু বলল, "পায়ের তলায় পাথর ঠেকলে একরকম লাগে। আর লোহার পাতের মতন প্লেন কোনও জিনিস ঠেকলে অন্যরকম লাগে। আমার সেই অন্যরকম লেগেছিল।"

ভার্মা বললেন, "লোহার ঝনঝন শব্দ হয়েছিল?"

সন্তু মাথা নিচু করে বলল, "তা অবশ্য হয়নি। কিংবা হলেও আমি শুনতে পাইনি। শুধু আমার অন্যরকম লেগেছিল।"

রানা জিজ্ঞেস করল, "সে জায়গাটা কোথায়?"

সন্তু আঙুল তুলে বলল, "সে জায়গাটা এখানে নয়। ওই দিকে। সেখানে একটা কাঠির ওপর একটা লাল রুমাল বেঁধে রেখেছিল মিংমা। হয়তো খুঁজলে সে জায়গাটা বার করা যেতে পারে।"

ভার্মা বললেন, "আমরা শুধু এখানে সময় নষ্ট করছি। এদিকে হয়তো মিঃ রায়চৌধুরী কোনও কারণে আহত হয়ে গম্বুজে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। ধরা যাক, সন্তু যেখানে বরফে ডুবে গিয়েছিল, সেখানে বরফের নীচে একটা লোহার পাত পড়ে আছে। কেউ-না-কেউ হয়তো কখনও ফেলে গিয়েছিল। তার

সঙ্গে এখানকার রহস্যটার সম্পর্ক কী ? অ্যাঁ ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর মুখে শুনেছি, কেইন শিপটন নামে একজন অভিযাত্রী এই রকম জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কাকাবাবু তাঁর খোঁজেই এসেছেন। তারপর কাকাবাবুও সেই জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এর মধ্যে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে না ?"

ভার্মা বললেন, "এর মধ্যে আবার কেইন শিপটনের কথা এল কী করে ? কে বলল, মিঃ রায়চৌধুরী কেইন শিপটনের খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন ? কেইন শিপটন বিদেশি, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। এ নিয়ে ভারত সরকার মাথা ঘামাবে কেন ? তোমার কাকাবাবু ইয়েতির রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করবেন বলে ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইয়েতি সম্পর্কে আমার একটা থিয়োরি আছে, চলুন গম্বুজে ফিরে গিয়ে বলব !"

রানা সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বলতে চাইছিলে ?"

সন্তু বলল, "যেখানে রক্ত পড়ে আছে, ওই জায়গার বরফটা একটু খুঁড়ে দেখলে হয় না ? যদি ওর নীচে কিছু থাকে ? ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুর পক্ষে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় !"

ভার্মা বললেন, "মিংমা তো দেখল যে ওখানকার বরফ শক্ত, তার নীচে তোমার কাকাবাবু যাবেন কী করে ? মিছিমিছি বরফ খুঁড়ে লাভ নেই কোনও। চলুন, মিঃ রানা, গম্বুজের দিকে চলুন, আমি আর থাকতে পারছি না।"

রানা গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার যদি খুব শীত করে তাহলে আপনি গম্বুজের দিকে এগোন, মিঃ ভার্মা। এই ছেলেটি যখন বলছে, তখন বরফ খুঁড়েই দেখা যাক। মিঃ রায়চৌধুরীর

জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।"

ভার্মা বললেন, "আকাশের অবস্থাটা একবার দেখুন !"

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই আকাশের অবস্থা হঠাৎ আবার বদলে গেছে। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ ছিল কিছুক্ষণ আগেও। এখন কালো-কালো মেঘ উড়ে আসছে যেন কোথা থেকে। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। অথবা ঝড় ওঠাও আশ্চর্য কিছু নয়। ঝড়ের মধ্যে বাইরে এরকমভাবে থাকা বেশ বিপজ্জনক।

মিংমা তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা গাঁইতি বার করে বলল, "আমি ঝটপট খুঁড়ে দেখছি, সাব। বেশি টাইম লাগবে না।"

বলা মাত্রই সে ঝপাঝপ কোপ মারতে লাগল বরফের মধ্যে। দারুণ মজবুত মিংমার শরীর, তার হাত চলল একেবারে যন্ত্রের মতন। সন্তু তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখতে-দেখতে মিংমা অনেকখানি গর্ত খুঁড়ে ফেলল। ভার্মা আর রানা এসে সেই গর্তের মধ্যে উঁকি দিলেন। দু'জনেরই মুখে সন্দেহ। সত্যিই একজন মানুষ এতখানি শক্ত বরফের মধ্যে তলিয়ে যাবেন কী করে !

এক সময় মিংমার গাঁইতিতে ঠং করে শব্দ হল, আর সন্তু চমকে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

মিংমা আরও দু'তিনবার গাঁইতি চালিয়েই থেমে গেল। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও পরিশ্রমে তার কপালে ঘাম জমেছে। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে সে সন্তুর দিকে তাকিয়েই করুণ গলায় বলল, "লোহার পাত না আছে, সন্তু সাব। পাথর হ্যায়, পাথর !"

নিচু হয়ে সে এক টুকরো পাথর তুলে আনল।

ভার্মা বললেন, "বলেছিলাম না, নিছক পণ্ডশ্রম !"

রানা বললেন, "তাই তো !"

ভার্মা বললেন, "আর দেরি করবেন না ঝড় উঠবে, শিগগির চলুন!"

রানা বললেন, "হ্যাঁ, আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। চলুন, যাওয়া যাক!"

মিংমা সন্তুর হাত ধরে বলল, "চলো সন্তু সাব!"

সন্তু খুব জোরে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। লোকজনের সামনে সে কখনও কাঁদতে চায় না। কিন্তু তার মনে হল তারা যেন কাকাবাবুকে এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। অথচ, ঝড়ের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না।

ঝড় তখনই উঠল না বটে, কিন্তু আকাশটা ক্রমশ বেশি কালো হয়ে আসতে লাগল। ওরা সবাই মিলে ফিরে চলল গম্বুজের দিকে।

ভার্মা বললেন, "ঝড় উঠলে আরও কী বিপদ হবে জানেন? হেলিকপ্টারটা ফিরতে পারবে না! তাহলে সারা রাত আমাদের ওই ভুতুড়ে গম্বুজের মধ্যে থাকতে হবে! ওরে বাপরে বাপ! এখানে সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে!"

আর কেউ কোনও কথা বলল না। প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে ওরা এসে পৌঁছল গম্বুজটার কাছে। মিংমা দৌড়ে গিয়ে গম্বুজটার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু পরেই গম্বুজের ওপরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মিংমা বলল, "নেহি সাব, আংকল সাব ইধার ভি নেহি হ্যায়!"

রানা বললেন, "যাঃ, শেষ আশাটাও গেল।"

প্রায় তক্ষুনি ফট-ফট শব্দ পাওয়া গেল আকাশে। হেলিকপ্টারটা ফিরে আসছে। ভার্মা বললেন, "বাঃ, চমৎকার! তা হলে রাত্রে এখানে থাকতে হবে না। চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।"

সন্তু বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাব?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ। আমি চলে যেতে চাইছি বলে কি তোমরা আমাকে ভীতু ভাব? যে-শত্রুকে চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে লড়তে আমি কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে আমি জানি না। তোমার কাকাবাবু যে মিসিং, সে খবর ভারত সরকারকে এক্ষুনি জানাতে হবে। তারপর বড় সার্চ পার্টি এনে খুঁজতে হবে তাঁকে।"

রানা চিন্তিতভাবে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে আর থেকে কোনও লাভ নেই। ঝড় আসবার আগেই আমাদের ওড়া উচিত।"

সন্তু হঠাৎ বলল, "আমি যাব না!"

ভার্মা বললেন, "তুমি যাবে না?"

সন্তু ওদের থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে গোঁয়ারের মতন বলল, "আমি কিছুতেই যাব না! কিছুতেই না!"

তারপর ওঁরা দু'জনে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন সন্তুকে। সন্তু কিছুতেই রাজি নয়। সার্চ পার্টি তো আসবেই, ততদিন পর্যন্ত সন্তু এই গম্বুজের মধ্যে অপেক্ষা করবে!

ভার্মা বললেন, "ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? একা এখানে থাকবে!"

মিংমা বলল, "আমি সন্তু সাবের সঙ্গে থাকতে পারি।"

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। আর দেরি করার উপায় নেই বলে রানা আর ভার্মা উঠে পড়লেন হেলিকপ্টারে। ওদের বললেন, গম্বুজের লোহার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে। কাল সকালেই আবার হেলিকপ্টারটা ফিরে আসবে।

প্রবল গর্জন করে আবার হেলিকপ্টারটা উঠে গেল ওপরে। গম্বুজের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু আর মিংমা।

জ্ঞান ফেরার পর কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন পাতলা-পাতলা অন্ধকার। তিনি ভাবলেন বুঝি রাত হয়ে গেছে। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন, তা তো তিনি জানেন না।

পাশে হাত দিয়ে দেখলেন, বরফ নয়, তিনি শুয়ে আছেন পাথরের ওপর। এখানে তিনি কী করে এলেন? তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওরা তাঁকে ধরাধরি করে এনে এই পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়েছে? সন্তু কোথায়? রানা আর ভার্মাই বা কোথায় গেল?

কাকাবাবু ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

তারপরই তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাননি, কেউ তাঁর মাথায় খুব শক্ত কোনও জিনিস দিয়ে মেরেছিল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, মাথায় চটচট করছে রক্ত। বেশ ব্যথাও আছে।

তা হলে সত্যিই কেউ তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে?

কাকাবাবু উঠে বসলেন। তাঁর হাত-পা তো বাঁধেনি কেউ। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন এবং খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রিভলবারটাও আছে!

কাকাবাবু চোখে অন্ধকারটা সইয়ে নিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেলেন না। মনে হল, একটা কোনও মস্ত বড় গুহার মধ্যে তিনি আছেন। বাঁদিকে অনেক দূরে খানিকটা

ধোঁয়া-ধোঁয়া মতন অস্পষ্ট আলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে-আলোটা কিসের তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এপাশ-ওপাশ হাতড়েও তিনি ক্রাচ দুটো খুঁজে পেলেন না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্রাচ দুটো না থাকলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন, ইচ্ছেমতন চলাফেরা করতে পারেন না। তিনি আবার ভাবলেন, যে বা যারাই তাঁকে ধরে আনুক, রিভলবারটা নিয়ে নেয়নি কেন?

বেশ দূরে তিনি মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে তিনি কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, কে যেন মাইক্রোফোনে কিছু বলছে। কথার শেষে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে একটা। সব ব্যাপারটা তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হল। হিমালয়ে এই বরফের রাজ্যে মাইক্রোফোন?

তিনি মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝতে চাইলেন যে, তিনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন কি না। অমনি মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেল। তিনি এমনই অবশ হয়ে পড়লেন যে, আবার শুয়ে পড়তে হল তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। খানিকটা সুস্থ হবার পর তিনি রিভলবারটা বার করে পাশে নামিয়ে রেখে ওভারকোটের অন্য পকেটগুলো খুঁজতে লাগলেন। তাঁর কাছে নানারকম ওষুধ থাকে। কয়েকটা ট্যাবলেট পেয়ে গেলেন তিনি। অন্ধকারেই টিপে-টিপে বুঝে একটা ট্যাবলেট বেছে নিলেন। এটা ব্যথা কমাবার ওষুধ। কিন্তু ট্যাবলেট গিলতে গেলে জল লাগে, এখানে জল পাবার কোনও উপায় নেই। ওষুধটা খুব তেতো, তবু চুষে চুষে সেটাকে খেয়ে ফেললেন কাকাবাবু।

তারপর গলা থেকে স্কার্ফটা খুলে মাথায় একটা ব্যান্ডেজ

বাঁধলেন। বেশিক্ষণ রক্ত পড়লে তিনি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বেন।

এ-জায়গাটায় শীত বেশ কম। হাতের গ্লাভস খুলে ফেলার পরেও আঙুল কনকন করে না। নাকের ডগায় আড়ষ্ট ভাব নেই। এটা তা হলে মাটির নীচের কোনও গুহা। কোনও জায়গা থেকে নিশ্চয়ই হাওয়া আসে, কারণ নিশ্বাস নিতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

হঠাৎ কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন। কী যেন একটা জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর পিঠের ওপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে দু'হাতে জিনিসটাকে এক ঝটকা মারলেন। অমনি সেটা মাটির ওপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটা সাদা রঙের কুকুর।

কুকুরটা হিংস্রভাবে ডেকে আবার তেড়ে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু তাঁর সুস্থ পা দিয়ে সেটাকে এক লাথি মারলেন খুব জোরে। খানিকটা দূরে ছিটকে গেল কুকুরটা, আবার এসে ঘ্যাঁক করে তাঁর পা কামড়ে ধরল। কাকাবাবু জোর করে সেটাকে ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি খুব মোটা প্যান্ট পরে আছেন বলে কুকুরটা দাঁত বসাতে পারেনি।

কুকুরটা মাথা নিচু করে, পেছনের একটা পা আছড়াতে আছড়াতে রাগে গজরাচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাকাবাবু রিভলবারটা তুললেন। এক গুলিতেই কুকুরটাকে তিনি সাবাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু কাকাবাবু কুকুর ভালবাসেন। কুকুরটাকে তাঁর মারতে ইচ্ছে হল না। কুকুরটা জার্মান স্পিৎস জাতের, বেশি বড় নয়। এই জাতের এক-একটা কুকুর খুব হিংস্র হয় বটে, কিন্তু এর কামড়ে তো মানুষ মরে না!

তিনি কুকুরটাকে শান্ত করার জন্য চুঃ চুঃ শব্দ করতে

লাগলেন। তবু কুকুরটা আর একবার লাফিয়ে তাকে কামড়াতে এল। কাকাবাবু আগে থেকেই রেডি ছিলেন, সজোরে কষালেন এক লাথি।

কুকুরটা এবার ডাকতে-ডাকতে কাকাবাবুর পেছন দিকে চলে এল। কাকাবাবুও ঘুরে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা তো জ্বালাবে খুব। অথচ এমন সুন্দর একটা কুকুরকে মেরে ফেলারও কোনও মানে হয় না! কয়েকবার লাথি খেয়ে কুকুরটাও আর সহজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, একটা কোনও সুযোগ খুঁজছে।

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে কাকাবাবু কুকুরটার দিকে একটা গ্লাভস ছুঁড়ে মারলেন। কুকুরটা অমনি সেটা কামড়ে ধরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। তারপর হঠাৎই সেটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে। একটু বাদেই সেটা আবার ফিরে এল। তার মুখটা খালি। কাকাবাবু ভাবলেন, এই রে, গ্লাভসটা নষ্ট হয়ে গেল! কোথায় রেখে এল সেটাকে? যাই হোক, একটা যখন গেছে, তখন আর একটা রেখেই বা কী হবে! কাকাবাবু সেটাও ছুঁড়ে মারলেন কুকুরটার দিকে। সে সেটাকে মুখে নিয়ে খুব ঝাঁকাতে লাগল যেন বেশ একটা মজার খেলা পেয়েছে। আবার সে সেটা নিয়ে পালিয়ে গেল একই দিকে। আর ফিরে এল না।

কাকাবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন কুকুরটার জন্য। আর তার পাত্তা নেই। কাকাবাবু ভাবতে লাগলেন, একটা পোষা কুকুর এই গুহার মধ্যে কী করে এল? স্পিৎস কুকুর সাধারণত পোষাই হয়। হিমালয়ের এতখানি উচ্চতায় কোনও জন্তু-জানোয়ারই দেখা যায় না। চারদিকে বরফের রাজত্ব, এর মধ্যে একটা পোষা কুকুর! কিছুক্ষণ ভাবার পর কাকাবাবু আপন মনেই বললেন, হুঁ।

তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন দুপুরবেলার ঘটনা। কেউ একজন পেছন থেকে তাঁর মাথায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল।

তাহলে সন্তু আর অন্যদের কী হল ? তাদেরও কি মেরে এই গুহার মধ্যে কোথাও ফেলে রেখেছে ? রানা আর ভার্মার কাছে লাইট মেশিনগান ছিল, তাদের মারা অত সহজ নয়। কিন্তু তাঁকে যখন মারা হল, তখন ওরা কেউ বাধা দিল না কেন ? ওরা কোথায় ? বিশেষ করে সন্তুর জন্য তিনি খুব উতলা বোধ করলেন। এক্ষুনি ওদের খোঁজ করা দরকার।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে পড়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। দেয়ালের গা'টা এবড়ো-খেবড়ো। সেটা ধরে-ধরে এগোলেন খানিকটা। দূরে যেখানে আলোর মতন ধোঁয়া ভাসছে, তিনি সেইদিকে যেতে চান। কুকুরটাও ওইদিকেই পালিয়েছে।

মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন যে আওয়াজটা খানিক আগে শোনা গিয়েছিল, সেটা থেমে ছিল এতক্ষণ। এবার আবার সেই শব্দটা বেজে উঠল। কাকাবাবু মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। অনেক দূর থেকে খুবই অস্পষ্ট আসছে শব্দটা—তবু তিনি এবার একটু-আধটু বুঝতে-পারলেন। কোনও কথা কেউ বলছে না, শুধু কয়েকটা এলোমেলো সংখ্যা আর অক্ষর। এন সি ও থ্রি টু নাইন ফাইভ...আর জি টি ফোর ফাইভ জিরো জিরো জিরো...টি ও ওয়ান এইচ এইট এইট জিরো জিরো জিরো...

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলেন। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আওয়াজটা থেমে গেল, তারপর খানিকক্ষণ ঝনন ঝনন রেশ রইল। কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল। এইসব অক্ষর ও সংখ্যার মানে কী ? কে কাকে বলছে ? কিংবা এমনও হতে পারে, অন্য কিছু শব্দ আসছে, তিনি ভুল শুনছেন ! কিসের শব্দ ?

আর দু-এক পা এগোতে গিয়েই কাকাবাবু হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কিছুতে হোঁচট খেয়ে। তাঁর মাথায় আবার গুঁতো লাগল এবং ব্যথাটাও বেড়ে গেল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার

চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন আর জ্ঞান হারালে চলবে না। তিনি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। দূরের আলোর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যই কাছের অন্ধকার এখন বেশি অন্ধকার লাগছে।

একটু পরে ব্যথাটা একটু কমল, চোখেও খানিকটা দেখতে পেলেন। কিসে আঘাত লাগল সেটা বোঝবার জন্য হাত বুলোতে লাগলেন চার দিকে। একটা কিছুতে হাত লাগল। ভাল করে হাত দিয়ে দেখলেন, সেটা একটা লোহার বাক্স। তিনি বাক্সটা টেনে খোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। অনেক টানাটানি করেও তিনি সেটা খুলতে পারলেন না। গুহার মধ্যে তালাবন্ধ লোহার বাক্স ! কাকাবাবু বাক্সটার ওপর উঠে বসে আবার ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা। এই গুহাটা কোথায় ?

কাকাবাবু বেশিক্ষণ ভাবনার সময় পেলেন না। দূরে কুকুরটার ডাক শোনা গেল আবার। কাকাবাবু দেখলেন, দূরে সেই আলোর ধোঁয়ার মধ্যে কুকুরটা লাফালাফি করছে। কুকুরটা আবার এসে জ্বালাতন করবে। কাকাবাবুর খুব ইচ্ছে হল কুকুরটাকে আদর করতে। কুকুরটা যদি এত দুষ্টুমি না করত তাহলে ওকে কাছে ডেকে আদর করা যেত।

কুকুরটা কিন্তু এদিকে এল না। দূরেই খানিকটা লাফালাফি করে মিশে গেল ডান পাশের অন্ধকারের মধ্যে। আলোর ধোঁয়াটা কোথা থেকে আসছে সেটা জানা দরকার। মনে হচ্ছে যেন ওখানে একটা গর্ত আছে। কারণ ধোঁয়াটা এখন আসছে নীচের দিক থেকে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে যাবেন, সেই সময় কুকুরটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে ফিরে এল আবার। এবার সেদিকে তাকাতেই কাকাবাবুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কুকুরটার

পাশে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি। মাত্র এক পলক দেখা গেল সেটাকে। তারপরই মিলিয়ে গেল আবার।

কাকাবাবু দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইলেন। মূর্তিটাকে দেখে মানুষ মনে হল না, বরং যেন বিশাল একটা বাঁদরের মতন। লেজ আছে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু বাঁদরের মতন সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। কাকাবাবু বুঝলেন, এই রকম মূর্তিই সন্তু আর মিংমারা দেখেছে। এই তবে ইয়েতি ? কাকাবাবু রিভলবারটা শক্ত করে ধরে রইলেন।

আবার কুকুরটা ডেকে উঠল, আবার মূর্তিটাকে দেখা গেল, আবার মিলিয়ে গেল। এইরকম দু-তিনবার। কাকাবাবু বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কী হচ্ছে ওখানে।

এরপর সেই বিশাল বাঁদরের মতন মূর্তিটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়াল ; আর মিলিয়ে গেল না। কুকুরটা ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকছে আর লাফাচ্ছে। কিন্তু কুকুরটা ওই মূর্তিটাকে কামড়াবার চেষ্টা করছে না। এক সময় মূর্তিটা খপ করে দু'হাতে তুলে নিল কুকুরটাকে। কাকাবাবু ভাবলেন, এইবার ও বুঝি কুকুরটাকে মেরে ফেলবে। তিনি রিভলবারের সেফটি ক্যাচ খুলে ওদিকে টিপ করলেন।

কিন্তু মূর্তিটা কুকুরটাকে মারল না, মাটিতে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা ডাকতে-ডাকতে ছুটে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি লাথি ছুঁড়তে পারবেন না, কুকুরটা যদি ঝাঁপিয়ে কামড়াতে আসে, তিনি দু'হাত দিয়ে আটকাবেন।

কুকুরটা খানিকটা এসেই আবার ফিরে গেল মূর্তিটার কাছে। সেখানে কয়েকবার ডেকে আবার এদিকে ফিরল। তখন মূর্তিটাও এক পা এক পা করে আসতে লাগল এদিকে। কাকাবাবু প্রায়

নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

মূর্তিটা দুলে দুলে আস্তে আস্তে হাঁটে। সোজা এদিকেই আসছে। আলোর ধোঁয়াটা ওর পেছনে বলে কাকাবাবু ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

কুকুরটা কাকাবাবুর একেবারে সামনে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। আর লুকোবার কোনও উপায় নেই, প্রাণীটা আসছে তাঁরই দিকে। তাঁর থেকে পাঁচ-ছ' হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাকাবাবু রিভলবারটা সোজা তুলে ধরলেন প্রাণীটার বুকের দিকে। প্রাণীটা তাঁর চেয়েও লম্বা। কিন্তু যত বড় বাঁদরই হোক রিভলবারের এক গুলিতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবেই। প্রাণীটা এক দৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিকট একটা আওয়াজ করল। অনেকটা যেন অট্টহাসির মতন। কাকাবাবু ওর চোখ থেকে চোখ সরালেন না। প্রাণীটার চোখ দুটো গোল ধরনের, ভুরু নেই। সারা গায়ে বাঁদরের চেয়েও বড় বড় লোম। হাত দুটো খুব লম্বা।

প্রাণীটা দু'হাত তুলে আবার একটা ভয়ংকর চিৎকার করে এগোতে লাগল কাকাবাবুর দিকে। স্পষ্টই সে কাকাবাবুকে আক্রমণ করতে চায়। কাকাবাবু খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। এটা যদি ইয়েতি হয়, এটাকে মেরে ফেলা উচিত নয়। পৃথিবীর কেউ কখনও জ্যান্ত ইয়েতি ঠিকমতন দেখেনি। রহস্যময় প্রাণী হিসেবে একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু কাকাবাবুর নিজের প্রাণও তো বাঁচাতে হবে। তিনি ওকে একেবারে না মেরে পায়ে গুলি মেরে আহত করবেন ভাবলেন। সেই আওয়াজেও ও ভয় পাবে। রিভলবারের নলটা একটু নিচু করে তিনি ট্রিগার

টিপলেন।

কিন্তু গুলি বেরুল না, শুধু খট করে একটা আওয়াজ হল। কাকাবাবু ব্যস্তভাবে আবার ট্রিগার টিপলেন, এবারও গুলি বেরুল না। সেই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর রিভলবারে গুলি নেই। একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল তাঁর শরীরে।

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে— দুপুরবেলা তাঁর রিভলবারে গুলিভরা ছিল। কিন্তু এখন ওটার মধ্যে একটাও গুলি নেই। কেউ গুলি বার করে নিয়েছে।

বাঁদরের মতন প্রাণীটা খুব কাছে এগিয়ে এসেছে বলে কাকাবাবু প্রাণপণ শক্তিতে খালি রিভলবারটাই ছুঁড়ে মারলেন প্রাণীটার মাথা লক্ষ করে।

সেটা লাগলে নিশ্চয়ই প্রাণীটার মাথা ফেটে যেত। কিন্তু প্রাণীটা তার আগেই চট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে খুব কায়দা করে লুফে নিল রিভলবারটা। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীভৎসভাবে হাসির মতন শব্দ করল।

কাকাবাবু কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। তারপর তিনিও খুব জোরে হেসে উঠলেন হো-হো করে।

জন্তুটা কাকাবাবুর হাসি শুনে যেন একটু চমকে গেল।

কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা। জন্তুটা কাকাবাবুর দিকে চেয়ে মাথা দোলাতে লাগল একটু একটু। তারপর আবার একটা বিকট শব্দ করে দু'হাত উঁচু করে কাকাবাবুর গলা টিপে দেবার জন্য এগোতে লাগল।

কাকাবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জন্তুটা খুব কাছে আসতেই তিনি নিজেই আগে খপ করে চেপে ধরলেন ওর এক হাত। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন।

কাকাবাবুর একটা-পা দুর্বল, কিন্তু তাঁর দু'হাতে অসুরের মতন শক্তি। সেই হ্যাঁচকা টানে টাল সামলাতে না পেরে সেটা একেবারে কাকাবাবুর গায়ের ওপরে এসে পড়ল। কাকাবাবু প্রবল শক্তিতে জন্তুটাকে তুলে একটা আছাড় মারতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই জন্তুটা কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আর ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ভয়ংকরভাবে।

কাকাবাবুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়ু আর মিঃ কেইন শিপটন, আই প্রিজিউম?"

জন্তুটা আওয়াজ করে থামল। তারপর সেও ইংরেজিতে উত্তর দিল, "ইউ আর রঙ, মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যেই হোন, দয়া করে ওই মুখোশ আর ধড়াচূড়াগুলো খুলে ফেলবেন! তা হলে কথা বলার সুবিধে হয়।"

লোকটি মাথার পেছন দিকে হাত দিয়ে কিছু করতেই বাঁদর কিংবা ইয়েতির মুখোশটা খুব সহজেই খুলে গেল। কিন্তু তখনও লোকটির মুখে আর-একটি মুখোশ। একটা হলদে রঙের পলিথিন বা ওই জাতীয় কোনও কিছুর মুখোশ মুখের সঙ্গে সাঁটা। চোখে চশমা, কিন্তু তার কাচ দুটো রুপোর মতন ঝকঝকে। লোকটির

পোশাকের রংও হলদে আর খুব টাইট পোশাক। লোকটি খুব বেশি লম্বা নয়। কিন্তু বাঁদরের চামড়ার মধ্যে তাকে বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল, সম্ভবত উঁচু জুতোর জন্য।

কাকাবাবু মুখে খানিকটা বিরক্তির ভাব এনে বললেন, "এরকম অদ্ভুত পোশাকের মানে কী? আপনি বুঝি মুখ দেখাতে চান না?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "একটা বাঁদরের পোশাক পরে ইয়েতি সেজে আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন? আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন? আমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন আপনি বা অন্য কেউ আমার রিভলবার থেকে গুলি বার করে নিয়েছেন, সেটাও আমাকে ঠকাবার জন্য, তাই না?"

লোকটি কোমরে দু'হাত দিয়ে চুপ করে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাকাবাবু এবার বেশ কড়া গলায় বললেন, "আমাকে এখানে জোর করে ধরে আনা হয়েছে কেন? আপনি কে?"

লোকটি এবার ছোট করে একটু হাসল। তারপর বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে, আমিই আপনার হাতে ধরা পড়েছি। আর আপনি আমায় জেরা করছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় কেন ধরে এনেছেন, তা জিজ্ঞেস করব না? আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?"

লোকটি বলল, "আপনি বিখ্যাত লোক, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনার নাম অনেকেই জানে।"

লোকটি পকেট থেকে একটি ছোট্ট রুপোলি রঙের রিভলবার বার করে খেলা করার মতন দু' তিনবার লোফালুফি করল। তারপর হঠাৎ সেটা সোজা উঁচিয়ে ধরল কাকাবাবুর দিকে। আস্তে

আস্তে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, এটাতে কিন্তু গুলি ভরা আছে। আর এর একটার বেশি গুলি খরচ করতে হয় না।"

কাকাবাবু একটুও ভয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটি ট্রিগারে আঙুল রেখে বলতে লাগল, "ওয়ান, টু, থ্রি..."

কাকাবাবু আবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন, এরকম ছেলেমানুষির মতন ব্যাপার করছেন বারবার ? আপনি কি ভাবছেন, এইভাবে ভয় দেখিয়ে আমায় কাবু করবেন ? মৃত্যুভয় থাকলে কেউ খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চড়তে আসে ?"

এইসময় দূরে আবার সেই মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। কেউ ইংরেজিতে কতকগুলো অক্ষর আর সংখ্যা বললে।

লোকটি মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর রিভলবারটা নামিয়ে বলল, "সত্যিই, এরকমভাবে আপনাকে ভয় দেখানো যাবে না। তাছাড়া ভয় পাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মুখে তার ছাপ পড়ে। আপনাকে আমরা খুব ভদ্রভাবে, আস্তে আস্তে, অনেক সময় নিয়ে, মেরে ফেলব।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "আপনারা আমাকে খুন করবেন ?"

লোকটি বলল, "তাছাড়া আর উপায় কী, বলুন ? আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন।"

"আমাকে খুন করা শক্ত। এর আগে অনেকে চেষ্টা করেছে। কেউ তো পারেনি।"

"আমি দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী, এখান থেকে জীবিত অবস্থায় বেরুবার সত্যিই কোনও উপায় নেই আপনার। আপনি বেশি কৌতূহল না দেখালে আপনাকে এভাবে মরতে হত না।"

"আমাকে যদি মারতেই হয়, তাহলে শুধু শুধু দেরি করছেন

কেন ? আর এত কথাই বা বলছেন কেন ?"

"জানেন তো, খুব ভয় পেলে অনেকে হার্টফেইল করে। ভয় দেখিয়ে আপনাকে মেরে ফেলতে পারলে আমাদের অনেক সুবিধে হত।"

"ভয় দেখিয়ে মানুষ মারাই যদি আপনার শখ হয়, তাহলে আপনি বা আপনারা ভুল লোককে বেছেছেন।"

"হা-হা-হা, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি খুব চালাকের মতন কথা বলেন। আপনার সত্যিই মনের জোর আছে। আপনাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা হচ্ছে না, তার কারণ, আপনি জানেন কি, মৃতদেহও কথা বলে ?"

"কী ?"

"মনে করুন, আপনাকে গুলি করে কিংবা মাথায় ডাণ্ডা মেরে কিংবা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হল। তারপর আপনার মৃতদেহটা নিয়ে কী করা হবে ? বুঝতেই পারছেন, এটা—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "দেখুন ক্রাচ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে আমার একটু অসুবিধে হয়। আমি একটু বসতে পারি কি ?"

তারপর কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপর বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে পাইপটা বার করলেন। কিন্তু পাইপের তামাক যে পাউচটায় থাকে, সেটা পেলেন না। অন্য পকেটগুলো হাতড়েও দেখলেন, তামাকের পাউচটা নেই।

লোকটি বলল, "দুঃখিত, এখানে ধূমপান নিষেধ। সেই জন্যই আপনার পকেট থেকে তামাকটা বার করে নেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু শুধু পাইপটাই দাঁতে কামড়ে ধরে খুব শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, তারপর বলুন, আমার মৃতদেহটা নিয়ে কী করা হবে ?"

লোকটি বলল, "বুঝতেই পারছেন, এই জায়গাটা মাটির নীচে। সেইজন্যই এখানে ধূমপান চলে না। আপনার মৃতদেহটা এখানে রাখা যাবে না, কারণ পচে গিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরুবে। সেইজন্য আপনার মৃতদেহটা ওপরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। একদিন না একদিন কেউ সেটা খুঁজে পাবেই। ওপরে ঠাণ্ডায় বরফের মধ্যে মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় না। কেউ খুঁজে পাবার পরই আপনার মৃতদেহ কথা বলে উঠবে।"

কাকাবাবু বললেন, "অর্থাৎ আমার মৃতদেহটি পোস্টমর্টেম করলেই ধরা পড়ে যাবে যে কীভাবে আমায় মারা হয়েছে। বিষ খাইয়ে, নয় গুলি করে। না মাথায় হাতুড়ি মেরে।"

"ঠিক তাই। আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে বেশি বোঝাতে হয় না। ওইরকম অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু দেখলেই সরকারের সন্দেহ হবে, তখন এই জায়গাটায় খোঁড়াখুঁড়ি বাড়বে। আমরা এখানে বেশি লোকজনের আসা যাওয়া পছন্দ করি না। সেইজন্যই স্বাভাবিক মৃত্যুই সবচেয়ে সুবিধাজনক। দু'তিনমাস বাদে আপনার স্বাভাবিক মৃতদেহটা যদি কেউ খুঁজে পায়, যাতে আপনাকে খুন করার কোনও চিহ্ন নেই, তাহলে আর কেউ কোনও সন্দেহ করবে না। ভাববে, আপনি পাহাড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। কী, ঠিক নয় ?"

"হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দিন তো। আমি স্বাভাবিকভাবে দু'তিনমাসের মধ্যে মরতে যাব কেন ? আমার তো আরো অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে !"

"হা-হা-হা ! বাঁচতে কে না চায় ! আপনিও নিশ্চয়ই আরও তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঁচতে পারতেন, যদি আপনি কলকাতায় থাকতেন, কিংবা দার্জিলিং বেড়াতে যেতেন কিংবা আর-কিছু করতেন। এখানে এসে আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে কে

বলেছিল ? কেনই বা আপনি গম্বুজটার ওপরে রাত জেগে চোখে দূরবিন এঁটে বসে থাকতেন ?"

"হুঁ, আমার সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছুই জানেন দেখছি। আমার পেছনে আপনারা কোনও চর লাগিয়েছিলেন। কিংবা আমি ওয়্যারলেসে যে খবর পাঠাতাম, সেটা আপনারাও শুনে ফেলেছেন। কিন্তু যাই বলুন, দু' তিনমাসের মধ্যে আমার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর কোনও আশা নেই।"

"আছে, আছে, মিঃ রায়চৌধুরী, আছে। আপনাদের দেশ ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি লোক খুব স্বাভাবিকভাবে কেন মরে বলুন তো ?"

"এবার বুঝলাম ! আপনারা আমাকে না খাইয়ে মারতে চান।"

"না, না, না, না—একেবারে না-খাইয়ে নয়। কিছু খেতে দেব। আপনাদের দেশের বেশিরভাগ লোকেই শুধু একবেলা খায়। আপনিও একবেলা খেতে পাবেন। দু'খানা টোস্ট। একটি পাঁচ বছরের শিশুকে যদি শুধু দু'খানা টোস্ট খাইয়ে রাখা যায়, তা হলে সে তিনমাসের বেশি বাঁচে না। আপনার মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ দেড়মাস দু'মাসের বেশি পারবেন না।"

"যে চীনা ভদ্রলোকটিকে আপনারা গম্বুজের দরজার পাশে রেখে এসেছিলেন, তাকেও ওইভাবেই মেরেছেন ?"

"ওরে বাবা, ওই চীনা ভদ্রলোক এক অদ্ভুত মানুষ। আপনি বিশ্বাস করবেন কি, মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে উনি আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন ? অতি নিরীহ, শান্তশিষ্ট ভালমানুষ, কখনও গোলমাল করতেন না। আমরা ওঁকে পছন্দই করতাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁকে আমরা কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে পারি না—"

"আশ্চর্য !"

"সত্যি আশ্চর্য নয় ? মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে আড়াই বছর..."

"তা তো বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনারা আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছেন ?"

"আমরা ঠিক কতদিন এখানে আছি, আন্দাজ করুন তো ?"

কাকাবাবু দাঁত দিয়ে পাইপটাকে কামড়াচ্ছিলেন। এবার সেটাকে মুখ থেকে নামিয়ে ফেললেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় পাইপের ধোঁয়া না টানলে তাঁর চলে না। তিনি পাইপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললেন, আজ থেকে পাইপ টানা ছেড়ে দিলাম। কলকাতার বাড়িতে যে আট-ন'টা পাইপ আছে, সেগুলোও অন্য লোকদের দিয়ে দেব।

কুকুরটা খানিক আগে চলে গিয়েছিল, এই সময় আবার ফিরে এল। এবার কিন্তু সে আর কামড়াবার চেষ্টা করল না কাকাবাবুকে। কুঁইকুঁই করে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কাকাবাবু আস্তে করে তার মাথা চাপড়ে দিলেন, কুকুরটা সরে গেল না।

মুখোশ-পরা লোকটি বলল, "আপনি খোঁড়া বলেই আপনাকে বেঁধে রাখা হয়নি, আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। এক পায়ে লফিয়ে লাফিয়ে আপনার পক্ষে বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল। আপনাকে বিছানা পাঠিয়ে দেব, শুয়ে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমার বিছানায় দুটো বালিশ লাগে।"

"ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই। রবারের বালিশ, সেটা ফুলিয়ে আপনি যত ইচ্ছে উঁচু করে নেবেন। আর কিছু ?"

"এই কুকুরটা আমার গ্লাভস চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"ফেরত পাবেন। আর...ইয়ে, আপনার টোস্ট দু'খানি কি

আপনি কড়া চান, না নরমভাবে সেঁকা ?"

কাকাবাবু এক মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারলেন লোকটির মুখের ওপর। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় চোখের নিমেষে সামনে ঝুঁকে পড়ে লোকটির একটা পা ধরে মারলেন এক হ্যাঁচকা টান।

তাল সামলাতে না পেরে লোকটি দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।

সন্তু সারা রাত না ঘুমিয়ে ছটফট করল। কাকাবাবু কী করে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মানুষ কখনও অদৃশ্য হতে পারে না। কাকাবাবু নিশ্চয়ই কোনও খাদের মধ্যে পড়ে গেছেন। অথচ, সেখানে কাছাকাছি কোনও খাদের চিহ্নও নেই।

মাঝে মাঝে তন্দ্রার মধ্যে সন্তু একটা স্বপ্নই দেখতে লাগল বারবার। সে নিজে যেন বরফের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে, তারপর এক সময় তার পা ঠেকে যাচ্ছে লোহার পাতের মতন কোনও শক্ত জিনিসে।

তারপর তন্দ্রা ভেঙে গেলেই সন্তুর মনে হয়, এটা তো স্বপ্ন নয়, সত্যি। সে সত্যিই তো একবার বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল এই রকমভাবে।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে মিংমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

মিংমা ঘুমোয় একেবারে পাথরের মতন, আবার একটু ডাকলেই সে তড়াক করে উঠে বসে। দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, সন্তু সাব, তুমি নিদ যাওনি ?"

সন্তু বলল, "মিংমা, কাকাবাবু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সে জায়গাটা তুমি তো খুঁড়ে দেখলে। সেখানে পাথর ছিল, লোহার মতন কিছু দেখতে পাওনি ?"

মিংমা বলল, "না, সন্তু সাব, শুধু পাথরই ছিল।"

"আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ! আচ্ছা মিংমা, আমি একদিন যেখানে বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা তোমার মনে আছে ?"

"সেখানে তো একটা রুমালের নিশানা রেখে এসেছিলাম, কী জানি সেটা বরফে চাপা পড়ে গেছে কি না। বাতাসেভি উড়ে যেতে পারে।"

"চলো, এক্ষুনি সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে।"

"কিন্তু আংকলসাব যেখান থেকে গায়েব হয়ে গেলেন, সেখান থেকে তো ও জায়গাটা বহুত দূরে !"

"তা হোক ! তবু সে জায়গাটা পেলেই আমার চলবে।"

"সন্তু সাব, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। বরফকা নীচে পে পাথর থাক কি লোহা থাক, তাতে কী ফারাক আছে ?"

"বরফের নীচে পাথরই থাকে, লোহা থাকে না। যদি লোহার পাত থাকে, সেটা অস্বাভাবিক। সেটা ভাল করে দেখা দরকার। চলো, শাবল-গাঁইতি নিয়ে আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ি।"

"এখুনি ? আগে হেলিকপটার আসুক। রানা সাব আর ভার্মা সাব ওয়াপস আসবেন বলেছেন।"

"ওদের আসতে যদি দেরি লাগে ? তার আগে চলো, আমরা জায়গাটা খুঁজে দেখি !"

"তার আগে একটু চা খেয়ে নিই কম সে কম ? এত্না ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা না খেলে যে হাত-পা চলবে না !"

"তাহলে তাড়াতাড়ি চা বানাও !"

গম্বুজের মধ্যে জিনিসপত্র সবই আছে। স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে মিংমা গরম জল চাপিয়ে দিল।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল জোরে জোরে। এতে শরীরের আড়ষ্টতা কাটে, খানিকটা গা গরম হয়।

একবার সে ভাবল, মিংমার চা তৈরি হতে হতে সে বাইরে গিয়ে একটু ছুটে আসবে গম্বুজটার চারদিকে।

সে গিয়ে গম্বুজটার দরজা খুলতে যেতেই মিংমা বলল, "দাঁড়াও সন্তু সাব, একেলা যেও না, আমরা দু'জনে সাথ সাথ বাইরে যাব।"

সন্তু বলল, "আমি বেশিদূর যাচ্ছি না, এই বাইরে একটুখানি !"

সন্তু লোহার দরজাটা খুলল। তারপর খুব সাবধানে মুখ বাড়াল বাইরে। এখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি, বাইরে নরম, ঠাণ্ডা আলো। দূরে কালাপাথর পাহাড়টার রং এখন লালচে হয়ে গেছে।

দরজাটা ভাল করে খুলে সন্তু এক পা বাইরে এসে দাঁড়াল। কেন যেন অকারণেই তার গা ছমছম করছে। চারদিক এমন নিস্তব্ধ বলেই বুঝি ভয় হয়। রাত্তির বেলাও কোনও শব্দ শোনা যায়নি।

ডান দিকে তাকিয়েই সন্তু চমকে উঠল। গম্বুজের পাশের চাতালে একগাদা মুর্গির পালক ছড়ানো। শুধু পালক নয়, চোখ আর চামড়া সমেত মুর্গির মুণ্ডুও দু-তিনটে।

সন্তু চাপা গলায় ডাকল, "মিংমা—"

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে দৌড়ে চলে এল

ভেতরে। মিংমা তখন চা ছাঁকতে শুরু করেছে। সন্তুকে দৌড়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া হুয়া ?"

সন্তু বলল, "পালক, অনেক পালক..."

মিংমা কিছুই বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে সন্তু সাব ? পালক ? কিসকা পালক ? পালক দেখে তোমার ডর লাগল ?"

সন্তু বলল, "মুর্গির পালক। এখানে এল কী করে ? কারা যেন মুর্গির গলা মুচড়ে মেরেছে !"

মিংমা প্রথমে মাথা নিচু করে একটু ভাবার চেষ্টা করল। তবু ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "চা ঠাণ্ডা হো জায়গা। আগে চা পিয়ে লাও।"

সন্তু চায়ের গেলাসটা ধরে রাখতে পারছে না, এমনই হাত কাঁপছে তার ! সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছে। সে হলফ করে বলতে পারে, কাল বিকেল পর্যন্ত ওখানে কোনও মুর্গির পালক ছিল না। তাছাড়া এই বরফের দেশে মুর্গির পালক আসবেই বা কী করে ?

চায়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দশেক বিস্কুট খেয়ে ফেলল মিংমা। তারপর প্রায় বিড়ির সমান একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে আরামে দুবার টান দিয়ে বলল, "এবার চলো তো সন্তু সাব, দেখি কোথায় তোমার মুর্গির পালক।"

সন্তু আর মিংমা বেরিয়ে এল বাইরে। হাওয়ায় মুর্গির পালকগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আস্ত মুণ্ডু থেকে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হয় কেউ যেন ওদের গলা টিপে মেরেছে।

মিংমা একটা ছোট্ট শিস দিয়ে বলল, "বড়ি তাজ্জব কী বাত ! ইধার মুর্গা কোউন লায়ে গা ? জিন্দা মুর্গা !"

তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে পরের জিনিসটি দেখতে পেল। বরফ মেশা বালিতে টাটকা পাঁচ-ছটা খুব বড় পায়ের ছাপ ! দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকাল, একটাও কথা না বলে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দৌড়ে ফিরে এল গম্বুজটার মধ্যে। মিংমা দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিজের বুকের ওপর এক হাত চেপে ধরে বলল, "ইয়েটি ! ইয়েটি ! ইয়েটি !"

সন্তু বলল, "আমাদের কাছে রিভলবার নেই, কোনও অস্ত্র নেই !"

মিংমা আবার বলল, "ইয়েটি ! ইয়েটি !"

সন্তু বলল, "ইয়েতি মুর্গি খায় ! কিন্তু এখানে মুর্গি পেল কী করে ?"

মিংমা খানিকটা দম নিয়ে বলল, "হেলিকপটার নেহি আনে সে...আমরা বাহার যেতে পারব না !"

সন্তু বলল, "ইয়েতিটা কি এখনও এখানে আছে ? কোনও সাড়া-শব্দ শুনতে পাইনি। আচ্ছা মিংমা, ইয়েতি কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ? মানে, ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে ?"

মিংমা একটা হাত ঘুরিয়ে বলল, "কেয়া মালুম !"

তারপর আরও ঘণ্টা-দেড়েক ওরা রইল গম্বুজের মধ্যে বন্দী হয়ে। দুজনেই বসে থাকল ওপরে জানলাটার কাছে ঠেসাঠেসি করে, কিন্তু হেলিকপটারের কোনও পাত্তা নেই। ইয়েতিরও কোনও চিহ্ন নেই। সেটা কি লুকিয়ে আছে ওদের ধরবার জন্য ?

সন্তুর আস্তে আস্তে ভয় কেটে গেল। একসময় তার মনে হল, এরকমভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে বাইরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করাও অনেক ভাল। এর আগে সে যত ইয়েতির গল্প পড়েছে, তাতে কোনও ইয়েতিই কিন্তু মানুষকে মারেনি। ইয়েতি মানুষের কাছে দেখা দিতে চায় না। এখানকার ইয়েতি রাত্তিরবেলা

গম্বুজের ধারে বসে মুর্গি খেয়ে গেছে, কিন্তু ওদের কোনওরকম বিরক্ত করেনি।

সন্তু বলল, "মিংমা চলো, বাইরে যাই!"

মিংমা বলল, "আভি? দাঁড়াও, হেলিকপটার জরুর আসবে।"

সন্তু তাকে কিছু না বলে নেমে গিয়ে খুলে ফেলল গম্বুজের দরজাটা। মিংমাও নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী করছ, সন্তু সাব?"

সন্তু কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। সে লক্ষ করল, ভয়ে তার বুক কাঁপছে না আর। সে দৌড়ে গোল করে ঘুরে এল গম্বুজটা। সেখানে কেউ নেই।

সন্তু এবার বলল, "মিংমা, সেই জায়গাটা খুঁজতে যাবে?"

মিংমা বলল, "কোন জায়গা?"

"যেখানে তুমি রুমালের নিশানা রেখেছিলে।"

"আর একটু ঠারো। হেলিকপটার এসে যাক।"

"না, আর আমার দেরি করতে ভাল লাগছে না। তুমি যাবে তো চলো।"

সন্তু গম্বুজের মধ্যে ঢুকে একটা স্নো-অ্যাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল। সে যাবেই দেখে মিংমাও অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে লাগল তার পিছু পিছু। সন্তু সোজা হাঁটছে দেখে মিংমা এক সময় বলল, "ডাহিনা, ডাহিনা চলো, সন্তু সাব।"

অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করল ওরা দু'জনে। কোথাও সেই লাল রুমালের চিহ্ন নেই। ইয়েতির ভয়ে ওরা বারবার পেছন ফিরে চেয়ে সব দিক দেখে নিচ্ছে। আকাশে আজ বেশ চড়া রোদ, সব দিক পরিষ্কার, এর মধ্যে কারুর কোথাও লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর বারবার মনে হচ্ছিল, হয়তো এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সে কোথাও কাকাবাবুকে শুয়ে থাকতে দেখবে।

কাকাবাবু তো আর সত্যিই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন না।

এক জায়গায় এসে মিংমা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সে যেন ঠিক বিপদের গন্ধ পায়। সন্তুর হাত চেপে ধরে সে বলল, "আউর যাও মত! খতরা হ্যায়!"

সেখানে বরফের ওপর শুয়ে পড়ল সে। তারপর হাতটা লম্বা করে জোরে একটা গাঁইতির ঘা দিল। অনেকখানি বসে গেল গাঁইতিটা। বুঝতে কোনও ভুল হয় না যে ওই জায়গাটা ফাঁপা!

সন্তু দারুণ উত্তেজনা বোধ করল। পেয়েছে, এবার তারা ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। এই জায়গাটাতেই সন্তু বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সেদিন।

মিংমা এদিক-ওদিক গাঁইতি চালিয়ে বুঝে নিল, ঠিক কতখানি জায়গা ফাঁপা সেখানে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বরফ কোপাতে লাগল, সন্তুও যোগ দিল তার সঙ্গে।

এখানে একটু পরিশ্রম করলেই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। এমনিতেই এখানকার বাতাস বেশ ভারী। খানিকক্ষণ কুপিয়েই সন্তু বেশ হাঁপিয়ে গেল। কিন্তু মিংমার কী অসাধারণ শক্তি, সে কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। এর মধ্যে সে বেশ একটা বড় চৌবাচ্চার মাপে গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। তারপর সে গর্তের এক পাশ থেকে ঝুঁকে নীচে গাঁইতি চালাতে লাগল। একসময় সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে।

আরও কয়েকবার বেশ জোরে গাঁইতি চালাবার পর মিংমা মুখ তুলে সন্তুকে বলল, "তুম ঠিক বোলা, সন্তু সাব নীচে লোহা হ্যায়!"

সন্তুও তখন লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে। দু'জনে মিলে আরও খানিকটা বালি-মেশানো বরফ সরিয়ে ফেলার পর দেখা গেল, সেখানে পাতা রয়েছে একটা লোহার পাত। কিন্তু

তাতে কবজা কিংবা গুপ্ত দরজা কিছুই নেই।

সন্তু বলল, "এখন দেখা দরকার, এই লোহার পাতটা কত বড়! এখানে বরফের তলায় কে এরকম লোহার পাত রাখবে? কোনও অভিযাত্রীদল নিশ্চয়ই এতবড় লোহার পাত বয়ে নিয়ে আসে না!"

মিংমা কপালের ঘাম মুছল বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। আবার খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! লোহার পাতটা কত বড় কে জানে! লোহার পাতটা দেখে অবশ্য মিংমাও খুব অবাক হয়েছে। একটা কোনও দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে তার মাথার চুল।

আবার নতুন উৎসাহে সে বরফ পরিষ্কার করতে লাগল। লোহার পাতটা বেড়েই চলেছে। কতখানি জায়গা জুড়ে যে এটা পাতা আছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

মিংমা এক সময় জিজ্ঞেস করল, "আউর কেয়া করনা, বোলো সন্তু সাব!"

সন্তুও ঠিক বুঝতে পারছে না। এরকমভাবে আর কতক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি চলবে? এ তো একজন দু'জন মানুষের কাজ নয়। তবে একটা দারুণ জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, এটাকে আর হারালে চলবে না কিছুতেই।

এই সময় খ্যার খ্যার শব্দ শোনা গেল হেলিকপটারটার। দূরের আকাশে দেখা গেল একটা কালো বিন্দু। মিংমা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "আ গয়া! আ গয়া!"

কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না মিংমা। ওরা আগে লক্ষই করেনি যে, লোহার পাতটার এক জায়গায় চুলের মতন সরু দাগের জোড়া আছে। সেই জায়গাটা ফাঁক হয়ে একটা দিক ঢালু হয়ে যেতেই সন্তু গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের অন্ধকারে। মিংমাও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে সে দু' হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল খাদের

ওপরটা।

দুটো লোহার পাতের মাঝখানে আটকে গেল মিংমার পায়ের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত। সে যন্ত্রণায় আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করতে লাগল।

কাকাবাবু রিভলবারটা তুলেই দেয়ালের দিকে সরে গেলেন। তারপর রিভলবারটা টিপ করে রাখলেন লোকটির মাথার দিকে।

পড়ে যাবার পর লোকটি কোনও শব্দও করল না, একটুও নড়ল না। একই জায়গায় পড়ে রইল, উপুড় হয়ে। কাকাবাবু ভাবলেন, পাথরে মাথা ঠুকে কি অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটি? কিন্তু অত জোরে তো পড়েনি! ও অন্য কোনও কায়দা করার চেষ্টায় আছে?

কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, "আপনি উঠে বসুন, তারপর আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। কোনওরকম ছেলেমানুষি করতে যাবেন না, আমার টিপ খুব ভাল, এক গুলিতে আপনার মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি।"

লোকটি তবু নড়ল না।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেই সে তখন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাকাবাবু কুকুরটাকে ছুঁড়ে দেবার পরই সেটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। খানিকটা দূরে গিয়ে কুঁই-কুঁই করে ডাকছে। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ দিলেন না। লোকটির উদ্দেশে

আবার বললেন, "আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যে উঠে না বসলে আমি আপনার গায়ে গুলি করব! এক...দুই..."

সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ জোরালো সার্চ লাইটের আলোয় ভরে গেল সুড়ঙ্গটা। এতই জোর আলো যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল কাকাবাবুর। তিনি এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলেন।

লোকটি এবার উঠে বসল আস্তে-আস্তে।

কাকাবাবু তাকে হুকুম দিলেন, "আলোর দিকে পেছন ফিরে বসুন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন না।"

এবার গম-গম করে উঠল মাইক্রোফোনের আওয়াজ। কে যেন একজন বলল, "অ্যাটেনশান প্লীজ! মিঃ রায়চৌধুরী, ক্যান ইউ হীয়ার মি? মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার হাতের পিস্তলটা ফেলে দিন! প্লীজ।"

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে কোথায় লাউড স্পীকার ফিট করা আছে। কিছু দেখতে পেলেন না। ভাল করে তাকাতেই পারছেন না তো!

মাইক্রোফোনের আওয়াজে আবার সেই কথাটা ভেসে এল।

কাকাবাবু এবার উত্তর দিলেন, "হু'এভার ইউ আর...সামনে এসে কথা বলুন, আমি এখন পিস্তল ফেলব না।"

মাইক্রোফোনের আওয়াজটা থেমে গেল। হঠাৎ দারুণ স্তব্ধ মনে হল জায়গাটা। মুখোশপরা লোকটি কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোন্ দেশের লোক?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "উত্তর না দিলে আমি গুলি করব!"

লোকটি তবু অবাধ্য ভঙ্গিতে ঝাঁকাল তার কাঁধ দুটো।

এইসময় গটগট. শব্দ হতেই কাকাবাবু চমকে তাকালেন। ঠিক

একইরকম হলদে মুখোশপরা তিনজন লোক অনেকটা মার্চ করার মতন একসঙ্গে হেঁটে আসছে এদিকে। তাদের হাতে বেশ লম্বা রিভলভারের মতন কোনও অস্ত্র।

তারা কাছাকাছি আসতেই কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, আর এগোবেন না! তাহলে আমি এই লোকটিকে মেরে ফেলব।"

লোকগুলো তবু থামল না, তাদের মধ্যে একজন ইংরেজিতে বলল, "মারুন! ওকে মারুন!"

চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে মুখটা একপাশে ফিরিয়ে কাকাবাবু রিভলভারের নলটা উঁচু করে ট্রিগারে হাত দিলেন।

লোক তিনটি কাকাবাবুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, "কই, ওকে মারলেন না? ট্রিগার টানলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ মারা আমার পেশা নয়। বিশেষত কোনও নিরস্ত্র লোককে অস্ত্র দিয়ে আমি আক্রমণ করি না কখনও!"

সেই লোকটি বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, দয়া করে এখানে গোলমালের সৃষ্টি করবেন না। আপনার ওপর আমরা কোনও অত্যাচার করতে চাই না—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে?"

"আপনার কোনও প্রশ্ন করাও চলবে না এখানে। আমরাই প্রশ্ন করব। আপাতত আমরা আপনার চোখ বেঁধে দিতে চাই।"

"না!"

"আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।"

"আপনারা দেখছি ভদ্রতার প্রতিমূর্তি! শুনুন, আমি মানুষ মারার জন্য গুলি চালাই না ঠিকই, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কারুর পা খোঁড়া করে দিতে পারি। আপনারা আমার গায়ে হাত দিলেই আমি এই লোকটির পায়ে গুলি করব।"

"ঠিক আছে, ওকে গুলি করুন না? খোঁড়া করে দিন! ওর একটু শাস্তি পাওয়া দরকার!"

আগের লোকটি এবার ভয় পাবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, "ওরে বাপ রে, না না! আমার মাথায় খুব জোর লেগেছে, উনি এত জোর ল্যাং মেরেছেন!"

দু'জন লোক কাকাবাবুর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ওদের ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালালেন। অমনি তাঁর রিভলবারের মধ্যে ঘর-র ঘর-র শব্দ হল আর মুখটায় এক ঝলক আলো জ্বলে

উঠল। কিন্তু গুলি বেরুল না।

লোকগুলি হেসে উঠল হা-হা শব্দে। মাটিতে বসা লোকটিও যোগ দিল সেই হাসিতে।

কাকাবাবু একই সঙ্গে অবাক ও বিরক্ত হয়ে রিভলবারটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

একজন মুখোশধারী বলল, "এবার বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে, ওটা একটা খেলনা পিস্তল!"

কাকাবাবু সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "একটা

খেলনা পিস্তল দিয়ে আর ইয়েতির পোশাক পরিয়ে এই ক্লাউনটিকে আপনারা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কেন ? আপনারা কি ভেবেছিলেন, আমার মতন মানুষ এতে ভয় পাবে ?"

তিনজন মুখোশধারীর মধ্যে একজনই সব কথা বলছিল। সে বলল, "আমাদের এখানকার জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই, তাই আপনার সঙ্গে একটু মজা করা হল। আমাদের হাতের এগুলো কিন্তু খেলনা নয় ! দেখবেন ?"

লোকটি সেই রিভলবারের মতন অস্ত্রটা কাঁধের ওপর রেখে পেছন দিকে গুলি চালাল। সাধারণ রিভলবারের থেকে শব্দ হল অনেক বেশি, দেয়ালে গুলি লেগে পাথরের চালটা ছিটকে পড়ল নানান দিকে, তার একটা কাকাবাবুর গায়েও লাগল।

লোকটি এরপর বলল, "নাম্বার সেভেন, উঠে দাঁড়াও, মিঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো ভাল করে বেঁধে দাও !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আপনারা আমার চোখ বাঁধতে চাইছেন কেন ?"

"ছিঃ ছিঃ রায়চৌধুরী, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে ? বললুম না যে আপনার কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।"

দু'জন লোক কাকাবাবুকে দু'পাশ থেকে ধরে দাঁড় করাল। কাকাবাবু শক্তভাবে বললেন, "আপনারা চারজন মিলে জোর করে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি চোখ খোলা রাখতে চাই। আর আমার ক্রাচ দুটো ফেরত পেলে খুশি হব।"

"আপনি চোখ খোলা রাখতে চান ? আচ্ছা, দেখা যাক, আপনি চোখ খোলা রাখতে পারেন কি না, আমরা জোর করব না !"

লোকগুলি তাদের প্যান্টের পকেট থেকে ঠুলির মতন বিশেষ ধরনের চশমা বার করে নিল। তারপর একজন চেঁচিয়ে বলল, "লাইট !"

তখন আলোটা আরও জোর হয়ে গেল। কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন। লোকগুলি হেসে উঠল। তাদের দলপতি বলল, "দেখলেন তো, চোখ খোলা রাখতে পারলেন না।"

কাকাবাবু উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার চোখ চাইতে পারছি।"

"কিন্তু আমরা যদি সব সময় এতটা আলো জ্বেলে রাখি, তাহলে আপনি কি শুধু একদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন ? তা কি হয় ?"

"আপনারা আমার চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যেতে চান ?"

"উঁহু, প্রশ্ন নয়, কোনও প্রশ্ন নয় !"

একজন একটা কালো রঙের বালিশের ওয়াড়ের মতন জিনিস গলিয়ে দিল কাকাবাবুর মাথায়। তারপর পেছন দিকটা টেনে ফাঁস বেঁধে দিল।

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমার হাত দুটো বাঁধবেন না ?"

"না। তার দরকার নেই।"

"তা হলে এটা তো আমি যে-কোনও সময় গিঁট খুলে দিতে পারি।"

"চেষ্টা করে একবার দেখুন তো। পারশিয়ান নটের কথা শুনেছেন ? স্বয়ং আলেকজান্দার পর্যন্ত যে গিঁট খুলতে পারেননি, এ হচ্ছে সেই ধরনের গিঁট।"

"হুঁ, কিছু লেখাপড়া জানা আছে দেখছি। আপনারা শিক্ষিত লোক, অথচ মুখোশ পরে রিভলবার হাতে নিয়ে থাকেন, অর্থাৎ গুণ্ডা, বদমাইসদের মতন কোনও বে-আইনি কাজ করছেন !"

"আপনি অরণ্যদেবের কমিকস পড়েন ? অরণ্যদেবও তো মুখোশ পরে থাকেন, তাঁর কাছে রিভলবারও থাকে, কিন্তু তিনি কি গুণ্ডা ?"

"ডোনট বি রিডিকুলাস ! কোথায় যেতে হবে চলুন ! আপনারা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছেন, কিন্তু আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে আপনারা সবাই ধরা পড়বেন এবং জেলে যাবেন !"

"সত্যি, মিঃ রায়চৌধুরী ? আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন ?"

"আমি কারুকে মিথ্যে ভয় দেখাই না ! ভাল্লুকের ছাল দিয়ে তৈরি ইয়েতির মতন একটা পোশাক পরে লোকদের ভয় দেখান আর খড়মের মতন কোনও জিনিস দিয়ে বরফের ওপর পায়ের ছাপ এঁকে আসেন। এসব ভেলকি বেশিদিন চলে না !"

"তিনদিন পরেই তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব বলছেন ? কে ধরতে আসবে ?"

"মিলিটারি পুলিশ। আপনাদের এখানে যত বড় দলবলই থাক, তবু কোনও সরকারের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনাদের নেই !"

"কিন্তু মিলিটারি পুলিশ কী করে আমাদের সন্ধান পাবে ?"

"ইয়েতি যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, এক পলক দেখা দেবার পরই মিলিয়ে যায়—এসব শুনে আমি বুঝেছিলুম যে, এখানে মাটির নীচে কোনও কাণ্ডকারখানা আছে।"

"সেকথা বোঝা স্বাভাবিক ! বিশেষ করে আপনার মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো বুঝবেনই। কিন্তু মিলিটারি পুলিশ বুঝবে কী করে যে মাটির নীচে ঠিক কোন জায়গায় আমরা আছি ? তারা তো সারা হিমালয়টা খুঁড়ে ফেলতে পারে না !"

কাকাবাবু চুপ করে গেলেন।

দলপতি বললেন, "অর্থাৎ সেকথা আপনি আমাদের বলে দিতে চান না। তাই না ? আমি যদি বলি, আপনি আমাদের মিথ্যেই ভয় দেখাচ্ছেন ! আমাদের সন্ধান বাইরের লোকের পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "উপায় নিশ্চয়ই আছে। ধরে নিন যে, আমার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি মনে-মনে খবর পাঠাতে পারি। আমি যেখানেই থাকি, আমার বন্ধুরা তা ঠিক টের পেয়ে যায়। আমাকে উদ্ধার করার জন্যই তারা এখানে এসে পড়বে !"

মুখোশধারীরা একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল।

দলপতি আবার বলল, "আপনার যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাও আমি জানি। সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ! এবার চলুন, অন্য জায়গায় গিয়ে কথাবার্তা হবে।"

দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে কাকাবাবুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কাকাবাবুর একবার মনে হল, ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় আসামীদের এইভাবে চোখমুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে একথা তাঁর বিশ্বাস হল না।

একজন মুখোশধারী বলল, "ইস, সত্যিই মিঃ রায়চৌধুরীর ক্রাচ দুটোর কথা খেয়াল করা উচিত ছিল। ওঁর হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে !"

অন্য একজন বলল, "ওঁকে উঁচু করে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক !"

কাকাবাবু আপত্তি করার আগেই ওরা সবাই মিলে কাকাবাবুকে শূন্যে তুলে নিয়ে দৌড়তে লাগল। বাধা দেওয়া নিষ্ফল বলে কাকাবাবু চুপ করে রইলেন।

বেশ খানিকটা যাবার পর ওরা এক জায়গায় এসে থামল, কাকাবাবুকে নামিয়ে দিল মাটিতে। অন্য একজন কেউ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "মিঃ রায়চৌধুরীকে ওই চেয়ারটায় বসিয়ে দাও। তারপর খুলে দাও মুখের ঢাকনাটা।"

কাকাবাবু অনুভব করলেন, ওরা পেছনের দিকে ফাঁসটা খোলার

চেষ্টাই করল না, একটা ছুরি দিয়ে চচ্চড় করে চিরে দিল কাপড়টা। পারশিয়ান নটই বটে!

সামনে তাকিয়েই কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "এ কী?"

কাকাবাবু প্রথমটায় সত্যিকারের ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলেন। পাথর কেটে বানানো হয়েছে একটা চৌকো মতন টেবিল। তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সন্তু। দেখলেই মনে হয়, সে মরে গেছে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দু'জন মুখোশধারী তাঁর হাত চেপে ধরে আছে। কাকাবাবু প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

তিনি ধরা গলায় বললেন, "এ কী! সন্তু এখানে এল কী করে? তোমরা সন্তুকে নিয়ে কী করেছ?"

মুখোশধারীরা কোনও উত্তর দিল না। ডান পাশ থেকে অন্য একজন কেউ বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী। ডু ইউ রেকগনাইজ মী?"

কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা খুব উঁচু চেয়ারে একজন সাহেব বসে আছে, আগাগোড়া কালো রঙের পোশাক পরা। এর মুখে কোনও মুখোশ নেই। মাথার চুলগুলো টকটকে লাল। তার গলায় ঝুলছে একটা সোনার হার, তাতে ঝুলছে একটা লকেট। লকেটটা আর কিছুই না, মানুষের দাঁতের চেয়েও অনেক বড় একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

কাকাবাবু প্রথমে ভাল করে দেখতে পেলেন না। তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সন্তুকে যে তিনি এত ভালবাসেন, সেটা আগে তেমন ভাবে বোঝেননি। অনেক দুঃখকষ্টেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে না। লোকজনের সামনে কাঁদবার মতন মানুষই তিনি নন। কিন্তু এখন তিনি চোখের জলও মুছতে পারছেন না, মুখোশধারীরা তাঁর হাত পেছন দিকে মুড়ে চেপে ধরে আছে।

তিনি ঘৃণার সঙ্গে বললেন, "তোমায় চিনব না কেন? তুমি কেইন শিপটন। আমার ভাইপোকে তোমরা মেরে ফেলেছ। এইটুকু একটা ছেলেকে মারতেও তোমাদের দ্বিধা হয় না? তুমি এতবড় খুনী? ছিঃ!"

কেইন শিপটন হা-হা করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "তোমার বাবাকে আমি চিনতুম। কতবড় লোক ছিলেন তিনি, তাঁর ছেলে হয়ে তোমার এই কাণ্ড! আমি তোমার সম্পর্কে সব খবর নিয়েছি। অল্প বয়েস থেকেই তোমার হঠাৎ বড়লোক হবার শখ। সেইজন্যই তুমি একবার ভাড়াটে সৈন্য হয়ে আফ্রিকার কঙ্গোতে নিরীহ লোকদের খুন করতে গিয়েছিলে। তারপর এক এভারেস্ট-অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছিলে। মিথ্যে মিথ্যে ইয়েতির গল্প রটিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলে একদিন। এখানে তুমি কোনও বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করছ। আমি সব বুঝেছি। তা বলে ওইটুকু একটা ছেলেকে মেরে ফেললে! তোমার কি বিবেক বলে কিছুই নেই? ওর বদলে তো তুমি আমাকে মারতে পারতে। আমিই তোমার আসল শত্রু!"

কেইন শিপটন হাত তুলে বলল, "অনেক কথা বলেছ, এবার থামো রায়চৌধুরী। তোমার এই ভাইপো একটা টেরিবল কিড। আজ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি, এমন-কী তুমিও পারোনি, ও তাই

পেরেছে। ও আমাদের এই মাটির নীচের বাঙ্কারে ঢোকার দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক, তবু ওর মৃত্যু বিফলে যায়নি। ও দেশের কাজ করার জন্য মরেছে। ও যখন দরজা আবিষ্কার করে এখানে ঢুকেছে, তখন বাইরে কোনও চিহ্ন রেখে এসেছে নিশ্চয়ই। বাইরে থেকে সাহায্য আসবে, তোমরা সবাই ধরা পড়বে!"

কেইন শিপটন বলল, "ডোন্ট বী টু অপটিমিসটিক, রায়চৌধুরী। দরজা আমরা আবার সীল করে দিয়েছি, বাইরে থেকে আর বোঝবার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া তোমার খেলনাটাও কোনও কাজে লাগবে না।"

কেইন শিপটন এবার হুকুমের সুরে বলল, "আনড্রেস হিম!"

অমনি চার-পাঁচজন মুখোশধারী কাকাবাবুকে জাপটে ধরে তাঁর পোশাক খুলে ফেলতে লাগল। বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবুর ওভারকোট, ওয়েস্টকোট, সোয়েটার, শার্ট সব খুলে ফেলার পর একেবারে নীচের উলের গেঞ্জির সঙ্গে লাগানো ছোট যন্ত্র দেখতে পাওয়া গেল। মুখোশধারীরা যন্ত্রটা খুলে নিয়ে দিল কেইন শিপটনের হাতে।

কেইন শিপটন সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, "হুঁ, কিউট লিটল থিং! শোনো রায়চৌধুরী, তুমি গম্বুজে বসে রেডিও টেলিফোনে যে-সব খবর পাঠাতে, সেই সব খবরই আমরা ইনটারসেপট করেছি। তোমার বুকের এই যন্ত্রটায় মাঝে-মাঝে বিপ-বিপ শব্দ হয়, আর সিয়াংবোচির রিসিভিং সেন্টারে সেটা ধরা পড়ে। তার থেকে তারা জানতে পারে, তুমি কখন কোথায়

আছ। তুমি আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে এসেছিলে। কিন্তু এটাও আমরা জানতে পেরে গেছি, সেইজন্যই গত চব্বিশ ঘন্টা আমরা সমস্ত ওয়েভ লেংথ জ্যাম করে দিয়েছি, তোমার এই যন্ত্রের পাঠানো আওয়াজ কেউ ধরতে পারবে না, বুঝলে? সুতরাং তুমি এখন কোথায় আছ, তা জানার সাধ্য বাইরের কারুর নেই। ক্লিয়ার?"

কাকাবাবু এর উত্তরে সংক্ষেপে বললেন, "আমার পোশাকগুলো ফেরত পেতে পারি? আমার শীত করছে।"

যদিও মাটির নীচে এই জায়গাটা বেশ গরম, তবু মাঝে-মাঝে এক-এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসছে যেন কোথা থেকে। কাকাবাবু পোশাক পরতে লাগলেন, মুখোশধারীরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। ওদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে কাকাবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সন্তুকে।

মুখোশধারীরা এসে কাকাবাবুকে আবার ধরে ফেলার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্তুর গা গরম। কোনও মরা মানুষের গা এরকম গরম হয় না।

কেইন শিপটন বলল, "হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে। ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, যাতে ও এখানকার কিছুই দেখতে না পায়, কিম্বা বুঝতে না পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। তবে ওকে ওই রকম হাত-পা ছড়ানো অবস্থায় শুইয়ে রেখেছেন কেন? দেখলেই মনে হয় যেন এক্ষুনি ওর পোস্টমর্টেম করা হবে।"

কেইন শিপটন বলল, "ওর ভাগ্য এখন আপনার হাতে নির্ভর করছে। ওকে আমরা মেরে ফেলতে পারি অথবা ওপরে নিয়ে গিয়ে এই অবস্থায় শুইয়ে রেখে আসতে পারি, এখানকার কথা ওর

কিছুই মনে থাকবে না।"

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। সন্তু এখানে একা এল কী করে? সন্তু যে এখানকার গুপ্ত দরজাটা আবিষ্কার করে ঢুকে পড়েছে, তখন আর কেউ সন্তুকে দেখেনি? সন্তু একা ছিল? রানা, ভার্মা, মিংমা—ওরা সব কোথায় গেল? এরা যদি সন্তুকে একা-একা ওপরে শুইয়ে রেখে আসে এরকম অবস্থায়, তা হলেও কি সন্তু বাঁচবে? এখন দিন না রাত তা বোঝার উপায় নেই। যদি রাত হয়, তা হলে বাইরে ঠাণ্ডায় সন্তু জমে যাবে।

উত্তরে তিনি বললেন, "আমার উপর নির্ভর করছে মানে? এই ছেলেটিকে বাঁচাবার বদলে তোমরা আমার কাছ থেকে কী চাও?"

কেইন শিপটন বলল, "আমাদের এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর দু' মাসের মধ্যে আমরা এ-জায়গাটা ছেড়ে চলে যাব। যন্ত্রপাতি সব বসান হয়ে গেছে, এই সব যন্ত্র এখন নিজে থেকেই চলবে।"

কাকাবাবু পেছন ফিরে একবার তাকালেন। কাছেই একটা জায়গা গোলভাবে রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বেশ গভীর গর্ত-মতন আছে। সেখান থেকে আবছা নীল রঙের আলো উঠে আসছে, আর হালকা ধোঁয়া ভাসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের যন্ত্রপাতি? গুপ্তচরের কাজের জন্য নিশ্চয়ই! তোমরা কোন দেশের হয়ে কাজ করছ?"

"সেটা তোমার জানবার দরকার নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দু' মাস পরে আমরা এখান থেকে চলে যাব, শুধু একজন লোক এখানে থাকবে। সেই লোকটি কে বলো তো? তুমি!"

"আমি?"

"হ্যাঁ। তোমাকে আর আমরা ওপরে উঠতে দিতে পারি না। তুমি বড্ড বেশি জেনে গেছ। তোমাকে আমরা খেতে না দিয়ে

আস্তে-আস্তে মেরে ফেলতে পারি, অথবা তুমি যদি আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি থাকো, সেটা তোমার পক্ষেই ভাল। খাবার-দাবার এখানে সবই পাবে, বেশ আরামেই থাকবে। তিন-চার মাস অন্তর-অন্তর আমাদের লোক এসে তোমার যা-যা দরকার সব দিয়ে যাবে। শুধু একটা কথা, জীবনে আর কখনও তুমি ওপরে উঠতে পারবে না।

"তুমি মূর্খের মতন কথা বলছ, কেইন শিপটন। ধরো আমি তোমাদের কথায় রাজি হলুম, তারপর তোমরা এখান থেকে চলে গেলেই তো আমি এখানকার সব যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করব। জেনেশুনে আমি বিদেশি গুপ্তচরদের সাহায্য করব? কিসের জন্য? টাকা? আমি যদি আর কোনওদিন ওপরে উঠতে না পারি, তা হলে টাকা দিয়ে আমি কী করব?"

"রায়চৌধুরী, এখানকার যন্ত্রপাতি ভাঙবার সাধ্য তোমার নেই। এখানে এমন যন্ত্র আছে, যা ছোঁয়া মাত্র তুমি মরে যাবে।"

"কোনও নিউক্লিয়ার ডিভাইস?"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি সেটা আগেই বুঝবে।"

"বুঝিনি তবে সন্দেহ করেছিলাম। এখানে যে বিদেশি গুপ্তচরচক্র খুব বড় রকমের একটা কিছু কারবার করছে, এই সন্দেহের কথা আমি ভারত সরকার আর নেপাল সরকারকে বারবার জানিয়েছি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।"

"সেইজন্যই তুমি একটা ওই পিকিং-দাঁত সঙ্গে নিয়ে ইয়েতি কিংবা প্রি-হিস্টোরিক ম্যানের সন্ধানের ছুতো করে এখানে এসেছিলে।"

"সেরকম একটা দাঁত তো তুমিও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ!"

"এতে সৌভাগ্য আছে। এটা গলায় ঝোলাবার পর থেকে আমি আর কোনও কাজে ব্যর্থ হইনি।"

"নিছক কুসংস্কার। তোমার মতন সাহেবরাও কুসংস্কার মানে। আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস, এই রকম দাঁতওয়ালা আদিমকালের কিছু মানুষ এখনও এদিকে কোথাও আছে। কোনও গহন-দুর্গম অঞ্চলে।"

"তাদের খোঁজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেই পারতে। আমাদের ব্যাপারে নাক না-গলালে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হত না। যাই হোক, শোনো। আমরা চলে যাবার পরেও যে এখানে কোনও লোক রাখার দরকার আছে তা নয়। তোমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি, তার কারণ, এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তুমি আমাদের সাহায্য না করলে, আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব কেন?"

"আমাকে মৃত্যু-ভয় দেখিও না, কেইন শিপটন। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে, আমার জীবনে অন্তত তার দশগুণ বেশি ঘটনা ঘটেছে। সেই হিসেবে আমি দশবার বেঁচে আছি। এখন যে-কোনও দিন আমার মৃত্যু হলেও আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি তোমাদের পরিষ্কার জানিয়ে রাখছি, আমার শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব তোমাদের ধরিয়ে দেবার। আমার ওপরে তোমরা যতই অত্যাচার করো, তবু তোমাদের মতন ঘৃণ্য গুপ্তচরদের আমি কোনও সাহায্যই করব না! তবে—"

"আরও কিছু বলবে? আজকে আমরা সবাই এখানে বেশ ছুটির মুডে আছি, তাই তোমার এই সব লম্বা-লম্বা লেকচার শুনছি। অন্য দিন আমরা এই সময় খুব কাজে ব্যস্ত থাকি। তবে কী?"

"আমি চাই, এই ছেলেটি বেঁচে থাক। আমার ভাইপো সন্তু, ওর এত কম বয়েস...অবশ্য দেশের কোনও কাজ করতে গিয়ে যদি মরে যায়, তাতে দুঃখ নেই। তোমরা আমাকে এখানে আটকে

রাখতে চাও রাখো, কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তুমি তোমার খোঁড়া পা নিয়েই কারুকে লাথি মারবে, কারুর গলা টিপে ধরবে, এসব ঝামেলা তো আমরা বারবার সহ্য করব না। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করতে রাজি না থাকো, তা হলে তোমার হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখা হবে।"

"তাই রাখো। কিন্তু এই ছেলেটিকে অজ্ঞান অবস্থায় বাইরে ফেলে রেখে এলে ও বাঁচবে কী করে? তুষারপাত হলেই তো মরা যাবে।"

"সেটা ওর ভাগ্য। বাঁচতেও পারে, মরে যেতেও পারে। ও যেখানে শুয়ে থাকবে, তার পাশে দেখা যাবে ইয়েতির কয়েকটা পায়ের ছাপ। ও যদি কোনও গুহার গল্পও বলে, তা হলে অন্যরা ভাববে সেটা ইয়েতির গুহা। ইয়েতিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

এই সময় কাকাবাবুর চোখ চলে গেল সন্তুর দিকে। সন্তুর চোখের পাতা দুটো যেন কেঁপে উঠল দু' একবার। একটা হাত পাশে ঝুলছিল, সেটা আস্তে বুকের ওপর রাখল।

কেইন শিপটনও এই ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে। সে অমনি ব্যস্ত হয়ে বলল, "কুইক, কুইক, ইঞ্জেকশান দাও! দা কিড মাস্ট নট সি হিজ আঙ্কল হীয়ার।"

দু'জন মুখোশধারী ছুটে গেল একটা ঘরের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে বেরিয়ে এল।

সন্তু এবার একটু পাশ ফিরে কাতরভাবে শব্দ করল, আঃ! তখনও তার চোখ বোজা।

কেইপ শিপটন অন্য মুখোশধারীদের বলল, "শিগগির রায়চৌধুরীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!"

তারা কাকাবাবুকে আবার চেপে ধরতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, ওকে আর ইঞ্জেকশান দিও না !"

মিংমার মনে হল যেন তার শরীরটা কোমরের কাছ থেকে কেটে দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে। দারুণ যন্ত্রণায় সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপটারটা ঘুরছে, সেদিকে সে একটা হাত নাড়তে লাগল প্রাণপণে, কিন্তু হেলিকপটার থেকে তাকে কেউ দেখতে পেল না।

একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে গেলে মানুষ অনেক সময় এক-একটা অসম্ভব কাজ করে ফেলে। দুদিকের লোহার পাত মিংমার কোমরের কাছে কেটে বসে যাচ্ছে, সেই অবস্থাতেও কোনওক্রমে এক ঝাঁকুনিতে সে ওপরে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবার জুড়ে গেল লোহার পাতটা।

ওপরে উঠে আসার পরই কিন্তু মিংমার আর কথা বলার ক্ষমতাও রইল না, নড়াচড়ার সাধ্যও রইল না। সে দু'তিন পা মাত্র গিয়েই ধপাস করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

হেলিকপটারটা কয়েক চক্কর ঘুরে তারপর নামল বেশ খানিকটা দূরে। তার থেকে তিনজন লোক নেমে এগিয়ে গেল গম্বুজটার দিকে। ভার্মা আর রানার সঙ্গে এবার এসেছেন টমাস ত্রিভুবন। ইনি নেপালি খ্রিস্টান, এক সময় বিদেশি অভিযাত্রী দলগুলির স্থানীয় ম্যানেজারের কাজ করতেন, এইসব জায়গা তাঁর নখদর্পণে। এখন বেশ বুড়ো হয়েছেন, সিয়াংবোচিতেই থাকেন।

মাথার চুলগুলো সব সাদা।

গম্বুজের মধ্যে কেউ নেই দেখে ওঁরা অবাক হলেন। ভার্মা বললেন, "আরেঃ, ছেলেটা আর শেরপাটা গেল কোথায় ?"

রানা বললেন, "ওদের তো গম্বুজের মধ্যেই থাকতে বলেছিলাম। ওরা আবার কোনও বিপদে পড়ল নাকি ?"

ভার্মা বললেন, "ওই কাকাবাবু, মানে মিঃ রায়চৌধুরী একটা পাগল ! নিজের তো প্রাণের মায়া নেই-ই, তাছাড়া, এরকম দুর্গম জায়গায় কেউ একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে আসে !"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "রানা, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছ ? গম্বুজের বাইরে মুর্গির পালক !"

ভার্মা বললেন, "কাল ওরা দু'জনে এখানে পিকনিক করেছে মনে হচ্ছে।"

রানা বললেন, "কিন্তু ওরা মুর্গি পাবে কোথা থেকে ? এই জায়গায় জ্যান্ত মুর্গি ? স্ট্রেঞ্জ ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ। আরে এদিকে দেখুন। পায়ের ছাপ। কত বড় পায়ের ছাপ !"

ভার্মা বললেন, "ইয়েতি ! এখানে ইয়েতি এসেছিল !"

বলতে-বলতে ভার্মা কোটের পকেট থেকে রিভলবার বার করলেন। তাঁর মুখে দারুণ ভয়ের ছাপ।

টমাস ত্রিভুবন পায়ের ছাপগুলোর কাছে বসে পড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন, "এরকম ছাপ আমি আগেও দেখেছি। দু' বছর আগে শেষ যেবার এসেছিলাম, তখন আরও অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি এখানে...এই জায়গাটায় কিছু একটা রহস্য আছেই।"

রানা গম্বুজের মধ্যে ঢুকে কাকাবাবুর একটা ক্যামেরা নিয়ে এলেন, তারপর পটাপট ছবি তুলতে লাগলেন সেই পায়ের ছাপের।

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "সেবার এসে দেখেছিলাম, এরকম ইয়েটির পায়ের ছাপের পাশে-পাশে একটা ছোট কুকুরের পায়ের ছাপ ! ইয়েটি আছে কি না আমি জানি না, কিন্তু কোনও কুকুর কি এরকম জায়গায় থাকতে পারে ? ইমপসিবল্ ব্যাপার নয় ? এখানেই কোথাও আমি দেখেছিলাম একটা লোহার পাত। রাত্রে খুব বরফ পড়ার পর সেটাকে আর খুঁজে পাইনি !"

ভার্মা বললেন, "লোহার পাত ? হা-হা-হা-হা ! এটা কিন্তু ইয়েতির পায়ের ছাপের চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার ! কোনও অভিযাত্রী টীম কি পাহাড়ের এত উঁচুতে লোহার পাত বয়ে আনবে ? আর কেনই বা আনবে !"

রানা বললেন, "সন্তু নামের ওই ছেলেটিও কিন্তু লোহার পাতের কথা বলেছিল ! দুজনের কথা মিলে যাচ্ছে !"

ভার্মা বললেন, "সে ছেলেটিও তো বাজে কথা বলেছিল। শুধু-শুধু কতখানি জায়গা খুঁড়ে দেখা হল, কিছু পাওয়া গিয়েছিল ? এই সব পাহাড়ি জায়গায় অনেক রকম চোখের ভুল হয়।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "আমি আর একটা কথা বলব ? আমার এ কথা অনেকে বিশ্বাস করে না। আমি এই জায়গা দিয়ে অনেকবার গেছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, এই গম্বুজটা থেকে কয়েক শো গজের মধ্যে একটা খাদ আর গুহার মতন ছিল। কয়েক বছর ধরে সেই খাদ কিংবা গুহা কিছুই দেখতে পাই না, সমস্ত জায়গাটা প্লেন হয়ে গেছে। অথচ সেরকম কোনও ভূমিকম্প-টম্পও হয়নি যে, একটা গুহা বুজে যাবে !"

ভার্মা বললেন, "গুহা শুধু নয়, খাদও বুজে গেল বলছেন ?"

ভার্মা রানার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন আর মাথার কাছে একটা আঙুল নাড়িয়ে বোঝালেন যে, বুড়ো বয়েসে টমাস ত্রিভুবনের মাথাটি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

টমাস ত্রিভুবন আপন মনে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, "এখান থেকে যে প্রায়ই লোকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার সঙ্গে ওই গুহা আর খাদ বুজে যাবার কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। দরকার হলে আমি ম্যাপ এঁকে আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পারি যে, কোন জায়গায় গুহাটা ছিল !"

রানা বললেন, "কাঠমাণ্ডুতে আমি খবর পাঠিয়েছি। একটা বড় সার্চ পার্টি কালকের মধ্যেই এসে পৌঁছবে ! ওদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আজ রাতটা আমরা এখানে কাটিয়ে দেখব, ইয়েটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কি না।"

ভার্মা বললেন, "এখানে রাত কাটাব ? আমি মশাই রাজি নই ! ওরে বাপ রে বাপ। পটাপট লোকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ! ইয়েতিকে অমন হালকা ভাবে নেবেন না !"

রানা চমকে উঠে বললেন, "তার মানে ?"

ভার্মা বললেন, "আসবার ঠিক আগেই আমি আর টি-তে খবর নিয়েছিলাম। কাঠমাণ্ডুর দিকে ওয়েদার খুব খারাপ। প্লেন উড়তে পারবে না। দু' তিনদিনের মধ্যে ওদের এদিকে আসবার কোনও সম্ভাবনা নেই।"

টমাস ত্রিভুবন চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন। এবার বললেন, "একজন লোক আসছে !"

সবাই সেদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। রানা পকেট থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে লাগিয়ে দেখে বললেন, "এই তো সেই শেরপা কী যেন ওর নাম !"

মিংমা প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। তার কোমরের দু'দিকে অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে অঝোরে। সে ব্যথা সহ্য করছে দাঁতে দাঁত চেপে।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সাব...উধার

চলো...লোহাকা দরওয়াজা !...সন্তু সাব অন্দর গির গিয়া...হামকো চোট লাগা !"

ভার্মা বললেন, "লোকটা কী বলছে পাগলের মতন ! এই, সন্তু কোথায় গেল ? ঠিক করে বলো ।"

মিংমা বলল, "অন্দর গির গিয়া...বহুত বড়া লোহাকা দরওয়াজা...'

ভার্মা বললেন, "লোকটার একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ! বললুম, ভুতুড়ে জায়গা !"

রানা নেপালি ভাষায় মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা গম্বুজ থেকে বেরিয়েছিলে কেন ? কোথায় গিয়েছিলে ? এখানে মুর্গির পালক এল কী করে ?"

মিংমা খুব জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিতে গেল । কিন্তু আর একটা কথাও বেরোল না তার মুখ দিয়ে, আবার সে মাটিতে পড়ে গেল ।

রানা তক্ষুনি তার পাশে এসে বসে পড়ে বললেন, "অজ্ঞান হয়ে গেছে ! এ কী, এর সারা গায়ে রক্ত !"

ভার্মা বললেন, "ও সন্তুকে খুন করেনি তো ?"

রানা এবার মুখ তুলে কঠোরভাবে বললেন, "এখন তো মনে হচ্ছে, আপনিই পাগল হয়ে গেছেন, মিঃ ভার্মা ! ও সন্তুকে খুন করবে কেন ? কী ওর স্বার্থ ? ও একবার পালিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছিল ওদের টানে ।"

ভার্মা বললেন, "সেইজন্যই তো সন্দেহ হচ্ছে । ওর কোনও মতলব আছে বলেই হয়তো ফিরে এসেছে ।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "একটু গরম দুধ বা চা খাওয়াতে পারলে ওর জ্ঞান ফিরবে, তখন ওর কাছ থেকে সব খবর নেওয়া যেতে পারে ! শুনলেন তো, এও লোহার দরজার কথা বলছে !"

ভার্মা বললেন, "পাহাড় আর বরফের রাজত্বে লোহার দরজা ! এ যে রূপকথা ! আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমাদের সবারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে ।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "গম্বুজের মধ্যে চা তৈরি করার ব্যবস্থা নেই ?"

রানা বললেন, "আছে। ভেতরে ওষুধ-পত্তরও আছে কিছু-কিছু। আপনার তো এসব ব্যাপারে কিছু জ্ঞান আছে, দেখুন তো কোনও ওষুধ একে খাওয়ানো যায় কি না । এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা খুবই দরকার ।"

ভার্মা বললেন, "তার চেয়ে একটা কাজ করলে হয় না ? এই লোকটা যখন এত অসুস্থ, তখন ওকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব । চলুন ওকে নিয়ে আমরা সিয়াংবোচি ফিরে যাই এক্ষুনি ।"

রানা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী, সন্তুর খোঁজ করব না ?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, ফিরে এসে করব। কিন্তু এই লোকটাকেও তো বাঁচানো দরকার। এর আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই বলে মনে হচ্ছে। দেখুন, সমস্ত পোশাক রক্তে ভিজে যাচ্ছে একেবারে। ওর ক্ষতটা কোথায় দেখেছেন ?"

রানা বললেন, "কোমরের কাছে। আশ্চর্য !"

ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য নয় ? এখানকার সব ব্যাপারটাই অদ্ভুত ! মানুষের কোমরের কাছে কাটে কী করে ? বুকে-পিঠে, হাতে-পায়ে চোট লাগতে পারে, কিন্তু কোমরের কাছে...এক যদি ভাল্লুক বা ইয়েতি কামড়ে ধরে..."

রানা বললেন, "লোহার দরজা হোক আর যাই হোক, ও বলছে, সন্তু কোনও একটা জায়গায় পড়ে গেছে। আমরা এখনও গেলে সন্তুকে উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু সে-জায়গাটা ও ছাড়া তো আর

কেউ দেখাতে পারবে না !"

টমাস ত্রিভুবন গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "গরম জল চাপিয়ে দিয়েছি। এই নিন, এই ওষুধটা ওকে খাইয়ে দিলে ও অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে, তাতে শিগগির ওর জ্ঞান ফিরতে পারে।"

রানা বললেন, "ওকে আমি তুলে নিয়ে গম্বুজের মধ্যে শুইয়ে দিচ্ছি। কোমরে এক্ষুনি একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার।"

রানা যেই মিংমাকে তোলবার জন্য নিচু হয়েছেন, অমনি ভার্মা বললেন, "তার আর দরকার নেই। মিঃ ত্রিভুবন, ওষুধটা ফেলে দিন !"

ওঁরা দু'জনে চমকে তাকাতেই দেখলেন ভার্মার রিভলবারটা ওঁদের দিকে তাক করা।

রানা বললেন, "এ কী ! এর মানে কী !"

ভার্মা বললেন, "আপনারা দু'জনেই গম্বুজের মধ্যে ঢুকুন। চটপট ! এক মুহূর্ত দেরি করলেই আমি গুলি চালাব !"

রানা বললেন, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? না, আপনি সত্যিই আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছেন ?"

রিভলবারটা সামনে রেখে ভার্মা এগোতে এগোতে বললেন, "আর একটাও কথা নয়, ভেতরে ঢুকে পড়ো...বারবার বললাম ফিরে যেতে...এখন মরো। তোমরা যতটুকু জেনেছ, তার বেশি আর জানতে দেওয়া যায় না !"

রানা আর টমাস ত্রিভুবন বাধ্য হয়েই গম্বুজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। টমাস ত্রিভুবন বিড়বিড় করে বললেন, "আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এই লোকটা বারবার অন্য কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট করতে চাইছিল। এর কোনও মতলব আছে।"

ওঁরা দু'জনে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভার্মা লোহার দরজাটা

বাইরে থেকে টেনে তালা লাগিয়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, "এখানে তোমরা নির্বাসনে থাকো ! ভেতরের ওয়্যারলেস সেটটা আমি আগেই খারাপ করে দিয়ে গেছি, এখান থেকে খবর পাঠাবারও কোনও উপায় নেই !"

তারপর ফিরে ভার্মা তাকালেন মিংমার দিকে। একবার ভাবলেন, ওকে ওই অবস্থাতেই ফেলে চলে যাবেন। তারপর আবার ভাবলেন, ঝুঁকি না নিয়ে ওকে একেবারে খতম করে দেওয়া যাক।

রিভলবারটা পকেটে রেখেছিলেন, আবার বার করে গুলি করতে গেলেন মিংমাকে।

মৃত্যুর ঠিক মুখোমুখি এসে মানুষ যে অসম্ভব কাজ করতে পারে দ্বিতীয়বার প্রমাণ দিল মিংমা। একটু আগেই তার জ্ঞান ফিরেছিল, সে সব দেখেছিল। ভার্মা আবার পকেট থেকে রিভলবার বার করতেই সে বিদ্যুৎবেগে একটা লাথি কষাল ভার্মার পেটে। আচমকা সেই আঘাতে ভার্মা মাটিতে পড়ে যেতেই মিংমা তার বুকের ওপর চেপে বসল। একখানা প্রবল ঘুঁষিতে প্রায় থেঁতলে দিল ভার্মার নাকটা।

মিংমা ঠিক তিনটি ঘুঁষি মারে ভার্মাকে। চতুর্থ ঘুঁষিটা তোলার পর সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। লোহার পাত তার কোমরের দু' দিকে কেটে বসেছিল, সেখান থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। অসম্ভব ব্যথায় সে আর

জ্ঞান রাখতে পারছে না।

ঘোলাটে চোখে সে তাকাল এদিক-ওদিক। রিভলবারটা ভার্মার হাত থেকে ছিটকে খানিকটা দূরে পড়ে আছে। মিংমা সেটাকে নেবার জন্য টলতে-টলতে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পড়ে গেল ধপাস করে।

প্রায় পাশাপাশি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল ভার্মা আর মিংমা। একটু দূরে রিভলবারটা।

গম্বুজের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রানা আর টমাস ত্রিভুবন কিছুই বুঝতে পারলেন না বাইরে কী হচ্ছে! ভার্মার ব্যবহারে রানা এতই অবাক হয়ে গেছেন যে, এখনও চোখ দুটি বিস্ফারিত করে আছেন।

টমাস ত্রিভুবন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওই ভার্মা লোকটা কে?"

রানা বললেন, "ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরীকে সাহায্য করবার জন্য ভারত সরকার ওকে পাঠিয়েছেন। এর আগেও ভারত সরকারের নানান কাজ নিয়ে ওই ভার্মা এদিকে এসেছে।"

"ওর পরিচয়পত্র সব ঠিকঠাক আছে কি না, আপনি নিজে দেখেছেন?"

"না, আমি নিজে দেখিনি। তবে কাঠমাণ্ডুতে আমাদের সরকারি অফিসে নিশ্চয়ই ওকে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়েছে।"

"সে পরিচয়পত্র জাল হতে পারে। যাই হোক, ও আমাদের এখানে আটকে রাখল কেন? ও বলল, আমরা বড় বেশি জেনে ফেলেছি। কী জেনেছি?"

"মাটির মধ্যে একটা লোহার দরজার কথা। মিংমার ওই কথাটাতেই ভার্মা বারবার বাধা দিচ্ছিল।"

টমাস ত্রিভুবন একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর গিয়ে বসলেন। তারপর রানাকে বললেন, "আপনি একটা কাজ করবেন? গম্বুজের দরজাটা ভেতর থেকে ভাল করে বন্ধ করে দিন। ভার্মা বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়েছে। ও যাতে হঠাৎ আবার ভেতরে ঢুকতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করা দরকার।"

রানা দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে আগে সেটাতে কান লাগিয়ে বাইরে কোনও শব্দ হচ্ছে কিনা শোনার চেষ্টা করলেন। কিছুই শুনতে পেলেন না। দরজা আটকে ফিরে এলেন।

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "এখানে বিস্কিট, মাখন, জ্যাম অনেক আছে। চা-কফি আছে। আমাদের না-খেয়ে মরতে হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে কতদিন থাকতে হবে।"

রানা বললেন, "কাঠমাণ্ডু থেকে আজই রেসকিউ পার্টি এসে পড়বার কথা। অবশ্য ভার্মা বলল, ওদিকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে বলে তিন-চারদিন প্লেন বা হেলিকপ্টার চলবে না!"

"সেটা সত্যি কথা না-ও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, ও নিজেই কোনও মিথ্যে খবর পাঠিয়ে রেসকিউ পার্টি ক্যানসেল করে দিয়েছে। দাঁড়ান, আগে একটু চা খাওয়া যাক। শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। চা খেলে মাথাটা পরিষ্কার হবে।"

টমাস ত্রিভুবন স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল চাপিয়ে দিলেন। রানা কিন্তু টমাস ত্রিভুবনের মতন শান্ত থাকতে পারছেন না। ছটফট করে ঘুরছেন ওইটুকু ছোট্ট জায়গার মধ্যে। নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বললেন, "এখান থেকে খবর পাঠাবারও কোনও উপায় নেই। কেউ জানতে পারবে না আমাদের খবর। ওয়্যারলেস সেটটাকেও খারাপ করে দিয়েছে!"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "সেটটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে

দেখব। ও ব্যাপারে আমার কিছুটা জ্ঞান আছে, দেখি সারিয়ে ফেলতে পারি কি না। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? একটা জিনিস লক্ষ করেছেন ? আমরা হেলিকপ্টারের কোনও আওয়াজ পাইনি ! তার মানে, আমাদের বন্দী করে ও পালায়নি এখনও।"

রানা বললেন, "পালাবে না। এখানেই ওর দলবল আছে। মিঃ রায়চৌধুরী যখন অদৃশ্য হয়ে যান, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে এখানে মাটির তলায় কিছু ব্যাপার আছে। একটা লোক তো আর এমনি এমনি আকাশে উড়ে যেতে পারে না !"

"লোহার দরজা যখন আছে, তখন তার ভেতরে মানুষও আছে। তারা কুকুর পোষে, ভেতরে জ্যান্ত মুর্গি রাখে। কুকুরের পায়ের ছাপ আমি আগেরবার এসে দেখেছি। এবারে এসে দেখলুম মুর্গির পালক। তার মানে বেশ পাকাপাকি থাকবার ব্যবস্থা। এরা কারা ?"

"নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তচর-দল।"

"কিন্তু মাটির তলায় বসে কী গুপ্তচরগিরি করবে ? আর এই বরফের দেশে গোপন কিছু দেখবার কী আছে ?"

"আজকালকার গুপ্তচরবৃত্তির জন্য চোখে দেখার দরকার হয় না। নিশ্চয়ই ওরা মাটির তলায় কোনও শক্তিশালী যন্ত্র বসিয়েছে। কাছাকাছি তিনটে দেশের সীমানা। তিব্বত অর্থাৎ চীন, রাশিয়া, ভারত—"

"হুঁ। এই ভার্মাটাও ওদের দলের লোক।"

চা তৈরি হয়ে গেছে, কাগজের গেলাসে চা ঢেলে টমাস ত্রিভুবন একটা এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। রানার মুখখানা দুশ্চিন্তায় মাখা, সেই তুলনায় টমাস ত্রিভুবন অনেকটা শান্ত।

আরাম করে চা-টা শেষ করার পর টমাস ত্রিভুবন বললেন, "এই গম্বুজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা বসবার জায়গা আছে

আমি জানি। সেখান দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। দেখুন তো এখানে কোনও বাইনোকুলার পান কি না !"

রানা বাইনোকুলার খুঁজতে লাগলেন আর টমাস ত্রিভুবন বসলেন রেডিও-টেলিফোন সেটটা নিয়ে। একটু নাড়াচাড়া করেই তিনি বললেন, "ইশ, এটাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। ভার্মা কখন এটাকে ভাঙল বলুন তো।"

রানা বললেন, "কোন এক ফাঁকে ভেঙেছে, আমরা লক্ষই করিনি। আপনাকে শুধু শুধু এই বিপদের মধ্যে নিয়ে এলাম ! আপনার আসবার কথাই ছিল না !"

ত্রিভুবন বললেন, "আমি এর আগেও তিনবার বিপদে পড়েছি জীবনে। একটা কথা ভেবে দেখুন তো, ভার্মা আমাদের দু'জনকে গুলি করে মেরেই ফেলতে পারত। আমাদের কিছুই করার ছিল না। না-মেরে যে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে, তার মানে আমাদের এখনও বাঁচার আশা আছে।"

রানা আফশোসের সুরে বললেন, "ইশ, কেন যে আমার লাইট মেশিনগানটা হেলিকপ্টারে ফেলে এলাম !"

ত্রিভুবন বললেন, "সেটা আনলেও কোনও লাভ হত না হয়তো। আপনি তো ভার্মাকে আগে সন্দেহ করেননি। সে হঠাৎ আপনার হাতে গুলিই চালিয়ে দিত। বাইনোকুলার পেলেন না ?"

"না ! মিঃ রায়চৌধুরীর গলাতেই একটা বাইনোকুলার ঝোলানো ছিল, যতদূর মনে পড়ছে। ওঃ হো ! আমার নিজের পকেটেই তো একটা রয়েছে ! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম ! আপনি বাইনোকুলার খুঁজতে বললেন, আর আমি অমনি খুঁজতে আরম্ভ করলাম।"

এত বিপদের মধ্যেও ত্রিভুবন হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "আপনার ওভারকোটের অন্য পকেটগুলোও খুঁজে দেখুন

তো, রিভলবার-টিভলভার আছে কি না ।"

রানা কোটের সব-কটা পকেট চাপড়ে দেখে নিয়ে বললেন, "না, নেই । আমার নিজস্ব কোনও রিভলবারই নেই ।"

"চলুন তাহলে গম্বুজের ওপরে উঠে দেখা যাক ।"

গম্বুজের ওপরে ছোট জানলাটা দিয়ে একজনের বেশি দেখা যায় না । বাইনোকুলারটা হাতে নিয়ে একবার রানা আর একবার ত্রিভুবন বাইরে দেখতে লাগলেন । বাইনোকুলার দিয়ে সাধারণত দূরের জিনিস দেখবার চেষ্টা করে । ওঁরাও দূরে দেখতে লাগলেন । গম্বুজের কাছেই যে ভার্মা ও মিংমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তা ওঁদের নজরে পড়ল না ।

বাইরে আলো কমে এসেছে । এরপর একটু বাদেই হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে । হেলিকপটারটা দূরে থেমে আছে । ছোট হেলিকপটারে বেশি লোক আঁটে না বলে এবার কোনও পাইলট আনা হয়নি, রানা নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন । অবশ্য ভার্মাও হেলিকপটার চালাতে জানে, ইচ্ছে করলে সে পালাতে পারত ।

একসময় বাইনোকুলারটা টমাস ত্রিভুবনের হাত ফসকে সিঁড়িতে পড়ে গেল । রানা বললেন, "ঠিক আছে, আমি তুলে আনছি ।" তখন টমাস ত্রিভুবন খালি চোখে তাকালেন বাইরে । অমনি তিনি দেখতে পেলেন ভার্মা আর মিংমাকে । তাঁর বুকটা ধক করে উঠল । উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, "রানা, রানা, এদিকে আসুন ! শিগগির !"

বাইনোকুলারটা কুড়িয়ে রানা দৌড়ে চলে এলেন ওপরে । ত্রিভুবন নিজে জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে রানাকে দেখতে দিলেন । রানা দেখেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "মাই গড ! ওরা দু'জনেই মরে গেছে ?"

ত্রিভুবন বললেন, "না, তা কী করে হয়! দু'জনে কী করে একসঙ্গে মরবে? মিংমা তো অজ্ঞান হয়েই ছিল।"

"কিন্তু ওই জায়গায় ছিল না। আরও অনেকটা বাঁ পাশে। কোনওক্রমে মিংমা উঠে এসেছিল। আমরা কোনও গুলির শব্দও পাইনি!"

"মনে হচ্ছে, কোনও কারণে দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"রিভলবারটা পড়ে আছে কাছেই।"

"কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! যদি ভার্মা ব্যাটা আগে জ্ঞান ফিরে পায়, তা হলে ও মিংমাকে এবার মেরে ফেলবে!"

"আর যদি মিংমা আগে জ্ঞান ফিরে পায়, তা হলে আমরা এক্ষুনি মুক্ত হতে পারি। মিংমা আমাদের দরজা খুলে দেবে!"

"মিংমাকে আগে জাগাতেই হবে! ওকে কীভাবে জাগানো যায়? এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—"

"না, তাতে লাভ নেই। তাতে ভার্মাই আগে জেগে যেতে পারে।"

"একটা কিছু করতেই হবে! মিংমাই আমাদের বেশি কাছে। যদি এখান থেকে ওর গায়ে জল ছুঁড়ে দেওয়া যায়?"

"অতটা দূরে কীভাবে জল ছুঁড়বেন?"

অবশ্য সেরকম কিছুই করতে হল না। একবার দূরের দিকে চেয়ে ওঁরা দু'জন আবার দারুণ চমকে উঠলেন।

আলো খুবই কমে গেছে। চতুর্দিকে হালকা অন্ধকার। তার মধ্যে দেখা গেল, মানুষের চেয়ে বড় আকারের দুটি প্রাণী এই গম্বুজের দিকে এগিয়ে আসছে।

অসম্ভব উত্তেজনায় রানা চেপে ধরলেন টমাস ত্রিভুবনকে। ফিস-ফিস করে বললেন, "ইয়েটি! ইয়েটি!"

টমাস ত্রিভুবন ভাল করে দেখে বললেন, "তাই তো মনে

হচ্ছে!"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটোর গায়ে ভাল্লুকের মতন বড় বড় লোম, তারা দুলে-দুলে হাঁটে। মাঝে-মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখে নেয়। তাদের মুখে কোনও শব্দ নেই।

বিস্ময়ে, রোমাঞ্চে এবং খানিকটা ভয়ে রানা একেবারে তোতলা হয়ে গেলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তা-তা-তা-হলে আ-আ-ম-ম-রা স-ত্যি ই-ই-য়ে-টি দে-দে-দে-খ-লা-ম!"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "চুপ! কোনও শব্দ করবেন না। ইশ, অন্ধকার হয়ে গেল, ওদের ছবি তোলা যাবে না!"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটো ভার্মা আর মিংমার মাথার কাছে দাঁড়াল, গম্বুজের দিকে তারা একবারও দেখছে না। হঠাৎ ওরা এক অদ্ভুত খেলা শুরু করল, ওদের মধ্যে একজন মিংমাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল অন্যজনের দিকে। সে খুব কায়দা করে লুফে নিল মিংমাকে। তারপর আবার সে ছুঁড়ে দিল এদিকে। এইভাবে তারা মিংমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল।

রানা ফিসফিস করে বললেন, "মিংমা মরে যাবে। ওরা মিংমাকে মেরে ফেলবে! ইশ, যদি লাইট মেশিনগানটা থাকত ইয়েটি দুটোকে খতম করতে পারতাম। পৃথিবীতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা দেখত সত্যিকারের ইয়েটির লাশ।"

ত্রিভুবন রানাকে জোরে চিমটি কেটে বললেন, "চুপ! চুপ! দেখুন, ওরা এবার কী করছে!"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটো মিংমাকে একসময় নামিয়ে দিল মাটিতে। তারপর ওদের একজন ভার্মাকে তুলে নিল। কিন্তু ভার্মাকে নিয়ে ওরা লোফালুফি খেলল না। তাকে নিয়ে ওরা চলে গেল দূরের ঘন অন্ধকারের দিকে।

সন্তু যেন একটা অন্ধকার সমুদ্রে ভাসছিল। একবার চোখ মেলেও সে কিছু দেখতে পেল না। বুঝতেও পারল না সে কোথায় আছে। মাথার ভেতরটা খুব ক্লান্ত, তার ইচ্ছে করল ঘুমিয়ে পড়তে।

হঠাৎ যেন কিছু চ্যাঁচামেচির শব্দ এল তার কানে। তার মধ্যে কাকাবাবুর গলা। অমনি একটা ঝাঁকুনি লাগল তার সারা শরীরে। সে পাশ ফিরে তাকাল।

প্রথমে তার মনে হল ভূত। কয়েকটা ভূত কাকাবাবুকে চেপে ধরেছে। তারপরেই বুঝতে পারল, ভূত-টুত কিছু নয়, কয়েকজন মুখোশ-পরা মানুষ।

সন্তু উঠে বসতে গেল। তার আগেই দু'জন মুখোশধারী চেপে ধরল তাকে। তাদের একজনের হাতে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ।

বন্দী অবস্থায় কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, পালা! যেমন করে হোক পালা!"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই কিছু চিন্তা না করেই পা তুলে একজন মুখোশধারীর পেটে কষাল খুব জোরে এক লাথি। তাতে তার হাত থেকে কাচের সিরিঞ্জটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

কেইন শিপটন রেগে বলে উঠল, "ক্লামজি ফুল! শিগগির আর একটা নিয়ে এসো!"

কেইন শিপটন নিজে উঠে এগিয়ে আসবার আগেই সন্তু টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপরই অন্ধের মতন

দৌড়ল।

কাকাবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, "সন্তু, পালা পা...।"

তক্ষুনি তাঁর মুখ চাপা দিয়ে দিল কেউ।

সন্তু দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখল সামনেই একটা লোহার রেলিং। মুখোশধারীরা তাকে তাড়া করে আসছে বুঝতে পেরে সে সেই রেলিং ধরে ভল্ট খেয়ে চলে গেল অন্যদিকে। সেইভাবে ঝুলতে-ঝুলতে তাকিয়ে দেখল, প্রায় একতলার সমান নীচে অনেক মেশিন-টেশিন রয়েছে। মুখোশধারীরা তাকে ধরে ফেলবার আগেই সে হাত ছেড়ে দিল, ধপাস করে পড়ল নীচে।

সন্তুকে পালাতে দেখে কেইন শিপটন কাকাবাবুর কোটের কলার ধরে টানতে-টানতে এনে শুইয়ে দিল পাথরের টেবিলের ওপর। তারপর রিভলভারের মতন দেখতে, কিন্তু সাধারণ রিভলভারের চেয়ে বেশ বড় একটা অস্ত্র তুলে বলল, "তুমি ওই ছেলেটিকে এক্ষুনি ফিরে আসতে বলো। নইলে তুমি মরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "না! সন্তু, ফিরে আসিস না!"

কেইন শিপটন বলল, "আমি ঠিক দশ গুনব! তার মধ্যে ফিরে আসতে বলো ওই ছেলেটাকে। ওয়ান টু..."

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই কিছুতেই ধরা দিবি না!"

কেইন শিপটন বলল, "থ্রী, ফোর..."

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? তুমি তা হলে আমাকে কিছুই চেনো না, কেইন শিপটন। তুমি আমায় মারতে পার, কিন্তু তুমি কিছুতেই এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না।"

কেইন শিপটন বলল, "ফাইভ, সিক্স..."

কাকাবাবু গলা চড়িয়ে বললেন, "সন্তু কিছুতেই আসবে না।

তুমি যতই ভয় দেখাও...”

সন্তু নীচে লাফিয়ে পড়ে প্রথমটায় ঝোঁক সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। তাতে অদৃশ্য কোনও কিছুতে ঠোকা লেগে গেল তার মাথায়। তারপরই সে বুঝতে পারল, মাঝখানের জায়গাটা শক্ত কাচ দিয়ে ঘেরা, সেই কাচে সে ধাক্কা খেয়েছে। কাচের দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো বড়-বড় যন্ত্র, সেগুলি থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে।

পায়ে খানিকটা ব্যথা লেগেছে সন্তুর, কিন্তু এমন কিছু না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল, গোল জায়গাটার চারদিকে চারটি সুড়ঙ্গ রয়েছে, সুড়ঙ্গগুলো অনেক লম্বা, শেষ পর্যন্ত দেখাই যায় না। এদিকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে কয়েকজন মুখোশধারী তাকে ধরবার জন্য।

সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পালাতে গিয়েও শুনতে পেল কেইন শিপটনের কথাগুলো আর কাকাবাবুর উত্তর। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কেইন শিপটন 'নাইন' গোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে বলল, “ডোন্ট কিল মাই আংকল। আই অ্যাম কামিং!”

ঘোরানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মুখোশধারী দুটির দিকেও হাত তুলে সে বলল, “আই অ্যাম কামিং!”

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, “না, আসিস না, সন্তু। আমাদের দুজনকেই এরা মারবে। দুজনে এক সঙ্গে মরে লাভ নেই!”

সন্তু সে-কথা গ্রাহ্য করল না। কাকাবাবুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সে কিছুতেই পালাতে পারবে না। সে আবার চেঁচিয়ে বলল, “ইয়েস, আই অ্যাম কামিং!”

এক পা এক পা করে এগোতে লাগল সে। মুখোশধারী দু'জন

তাকে ধরবার জন্য অপেক্ষা করছে। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে সন্তুর বুকের মধ্যে। এরা কারা? এরা কি সত্যিই তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে!

এগোতে এগোতে সন্তু দেখল, এক জায়গায় দেয়ালে ইলেকট্রিকের মিটারের মতন অনেকগুলো জিনিস। আর একটা লম্বা লিভার অর্থাৎ লোহার হাতলের মতন জিনিস সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। সেটা বেশ খানিকটা উঁচুতে।

বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। সে লাফিয়ে সেই লিভারটা ধরেই ঝুলে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল!

তারপর নানারকম চ্যাঁচামেচি আর হৈ-চৈ। ওপর থেকে কেইন শিপটন কড়া গলায় কী যেন হুকুম দিলেন। মুখোশধারী দু'জন অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজে ছুটে এল সন্তুকে ধরবার জন্য।

লিভারটা ধরে ঝুলে দোল খেতে খেতে সন্তু সামনের দিকে লাথি চালাতেই তার জোড়া পায়ের লাথি লাগল একজনের বুকে। সেই লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একজনের গায়ে। পেছনের লোকটা সেই ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে আন্দাজে গুলি চালাল সন্তুর দিকে।

ততক্ষণে সন্তু লিভারটা ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে পড়েছে। গুলিটা লাগল লোহার লিভারটাতে, সেটা ভেঙে ছিটকে উড়ে গেল। আর আলো জ্বলবার কোনও উপায় রইল না।

কেইন শিপটন চিৎকার করতে লাগল, “বোকার দল! ছেলেটাকে কেউ ধরতে পারলে না? শিগগির আলো জ্বালো, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে! আমরা দম বন্ধ হয়ে মরব!”

অন্ধকারে জড়াজড়ি করে সবাই ছুটে এল আলোর সুইচ-বোর্ডের দিকে। সন্তু একবার ভাবল, ওপরে কাকাবাবুর

কাছে যাবে। কিন্তু আবার ভাবল, সিঁড়ি দিয়ে অনেকে নামছে। ওদিকে যেতে গেলে সে ধরা পড়ে যাবে। দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সে উল্টো দিকে সরে যেতে লাগল। তারপর এক জায়গায় দেয়াল নেই টের পেয়ে বুঝল, এদিকে একটা সুড়ঙ্গ। সে ছুটল সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। খানিকটা গিয়েই একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, তারপর আবার উঠে ছুটল।

কেইন শিপটন নিজেই নেমে এসেছে সুইচ বোর্ডের কাছে। সবাইকে গালাগালি দিতে দিতে বলল, "ইডিয়েটের দল, একটা সামান্য বাচ্চা ছেলেকে ধরতে পারে না...টর্চ দাও, কার কাছে টর্চ আছে—"

কারুর কাছেই টর্চ নেই, একজন একটা সিগারেটের লাইটার জ্বালল। সেই সামান্য আলোয় দেখা গেল, সুইচ বোর্ডের একদিক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ওদিকে কাকাবাবু যখন বুঝলেন তাঁর কাছাকাছি আর কেউ নেই, তিনি আস্তে আস্তে টেবিলটা থেকে নামলেন। তাঁর পক্ষে ছুটে পালানো সম্ভব নয়। এই অন্ধকারের মধ্যে তো আরও অসম্ভব। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। আগেই তিনি দেখেছিলেন যে, কেইন শিপটন যে-চেয়ারটায় বসেছিল, তার পেছনে একটা লোহার দরজা আছে। প্রথমে দিক ঠিক করে নিয়ে তিনি একটু-একটু করে এগোলেন সেই দরজাটার দিকে। এক সময় হাতের ছোঁয়াতেই দেয়ালের বদলে লোহা টের পেলেন।

দরজাটা খোলাই ছিল, একটু জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কাকাবাবু ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আবার। চারদিকে হাত বুলিয়ে দেখলেন, দরজাটা বেশ মজবুত। ছিটকিনিও রয়েছে। ভেতর থেকে সেটাকে আটকে দিলেন শক্ত

করে।

তারপর ঘরের মধ্যে ভাল করে তাকাতেই তিনি চমকে উঠলেন খুব।

একটু দূরে একটা টাকার সাইজের গোল লাল আলো খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। সেই আলোটা দেখলেই ভয় হয়। মনে হয় যেন কোনও এক চক্ষু দানব দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে।

কাকাবাবু বুঝলেন, ওটা কোনও যন্ত্র। কিন্তু সব দিক একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার মধ্যে এই যন্ত্রের লাল আলোটা জ্বলছে কী করে? নিশ্চয়ই ওটার জন্য কোনও আলাদা ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবু যন্ত্রটার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ল, কেইন শিপটন একবার বলেছিলেন, এখানে এমন যন্ত্র আছে, যাতে হাত ছোঁয়ালেই মৃত্যু অনিবার্য। এটা সে-রকম কোনও যন্ত্র নয় তো?

কাকাবাবু কান পেতে শুনলেন, যন্ত্রটার মধ্য থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। তিনি আর যন্ত্রটার দিকে এগোলেন না। লাল আলোটা এমন তীব্র যে, ওদিকে চেয়ে থাকাও যায় না। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে তিনি আস্তে-আস্তে বসে পড়লেন। পাশে হাত রাখতেই আবার চমকে উঠলেন তিনি। একটা কোনও লোমশ জিনিসে তাঁর হাত লাগল। অমনি নড়ে উঠল সেই জিনিসটা, তারপরই ডেকে উঠল।

এটা সেই কুকুরটা। এই ঘরের মধ্যে এসে ঘুমিয়ে ছিল, কাকাবাবুর ছোঁয়া লাগতেই আবার জেগে উঠেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যেই এই দুষ্টু কুকুরটাকে নিয়ে কাকাবাবু আবার এক মহা মুশকিলে পড়লেন। কুকুরটা দেখতে ভারী সুন্দর, আকারেও বেশি বড় নয়, কিন্তু ঘেউ-ঘেউ করে সে তেড়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর ওপরে ওর রাগও আছে।

কাকাবাবু প্রথম দু'একবার কুকুরটার কামড় খেলেন। তারপর বেশি সাহস পেয়ে কুকুরটা তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি খপ করে সেটাকে ধরে ফেললেন দু'হাতে। কুকুরটা ছটফট করেও আর নিজেকে ছাড়াতে পারল না। কাকাবাবু এক হাতে কুকুরটার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে।

নীচের তলায় সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এক ধাক্কা খেল। গুহাটা সেখানেই শেষ। আবার পেছন ফিরতে গিয়েই তার মনে হল, দূরে কিছু লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এদিকেই আসছে?

কোণঠাসা ইঁদুরের মতন সন্তু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

তারপরেই আলো জ্বলে উঠল। কেইন শিপটন এর মধ্যে আলোর সুইচ ঠিক করে ফেলেছে।

সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গের মুখে দু-তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে লম্বা পিস্তল। আর দেখল, তার ঠিক সামনেই আর-একটা ছোট সুড়ঙ্গের পথ। সেটায় ঢুকতে গেলে সামনে একটুখানি দৌড়ে যেতে হবে, তাতে দূরের মুখোশধারীরা তাকে দেখে ফেলতে পারে। সেটুকু ঝুঁকি নিয়েই সন্তু এক দৌড়ে সেই সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে গেল।

আলো জ্বলে উঠতেই কাকাবাবু ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তখনও তিনি কুকুরটার মুখ শক্ত করে ধরে আছেন।

কুকুরটাকে নিয়ে মহা মুশকিল, ছেড়ে দিলেই ও কামড়াতে আসে। অনেক রকম আদর করলেও সে শান্ত হয় না, সারা শরীর কুঁকড়ে সে ছাড়া পেতে চাইছে।

ঘরটার একদিক জুড়ে রয়েছে বিরাট একটা যন্ত্র। তার ঠিক মাঝখানে সেই আলোটা জ্বলছে। যন্ত্রটা দেখলেই কেমন যেন ভয়-ভয় করে, মনে হয় যেন এক একচক্ষু দানব। কিছু প্যাকিং বাক্স ছড়ানো আছে চারদিকে, কাকাবাবু দু'একটা বাক্স খুলে দেখলেন তার মধ্যে রয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতির অংশ।

লাল চক্ষুওয়ালা যন্ত্রটার দিকে কাকাবাবু চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর বেশি জ্ঞান নেই, ওটা কিসের যন্ত্র তিনি বুঝতে পারলেন না। একবার ভাবলেন, এটা কি কমপিউটার? হিমালয়ের এই দুর্গম জায়গায় মাটির নীচে ঘর বানিয়ে কী ভাবে এরা এই এতবড় একটা যন্ত্র বসাল সে-কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাকাবাবু।

এক পা এক পা করে তিনি যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, এই যন্ত্রটায় হাত দিলেই যে কিছু বিপদ ঘটবে, তা তো হতে পারে না। কুকুরটা এই ঘরের মধ্যে ছিল, কুকুরটা এই যন্ত্রটা নিশ্চয়ই দু' একবার ছুঁয়েছে, ওর তো কিছু হয়নি।

কাকাবাবু যন্ত্রটার খুব কাছে এগিয়ে যেতেই পেছন দিকের দরজায় দুম-দুম শব্দ হল।

কাকাবাবু ফিরে দেখলেন, দরজাটা লোহার তৈরি এবং খুব মজবুত। তিনি খিল আটকে দিয়েছেন, আর বাইরে থেকে খোলার সাধ্য কারুর নেই। এখন এই ঘরের মধ্যেই তিনি নিরাপদ।

বাইরে থেকে কেইন শিপটনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ডোনট বিহেভ লাইক আ ফুল। দরজা খুলে

দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি দুঃখিত, এখন দরজাটা খুলতে পারছি না!"

কেইন শিপটন বলল, "শিগগির খোলো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ব্যস্ত আছি একটু। প্লীজ আমায় বিরক্ত কোরো না।"

কেইন শিপটন বলল, "এক্ষুনি খুলে দাও, নইলে ব্লাস্ট করে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলব!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের দরজা তোমরা ভাঙবে, এতে আমার কী করার আছে। ইচ্ছে হলে ভাঙো।"

কাকাবাবু যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন রঙের অনেকগুলো বোতাম যন্ত্রটার গায়ে সার-সার সাজানো। কাকাবাবু সাহস করে একটা বোতাম টিপলেন।

অমনি যন্ত্রটার মধ্য থেকে খুব জোরে আওয়াজ বেরিয়ে এল, "টু টু নাইন। কে ওয়াই সেভেন সেভন। আল্‌ফা ওমেগা..."

আওয়াজটা এত হঠাৎ আর এত জোরে হল যে, কাকাবাবু চমকে খানিকটা পিছিয়ে এলেন। যন্ত্র তো কথা বলতে পারে না, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে রেকর্ড করা আছে। এগুলো কোনও সাংকেতিক সূত্র।

কেইন শিপটন বলল, "খবরদার ওই যন্ত্রে আর হাত দিও না, তুমি মরে যাবে। দরজা খোলো, তোমার ভাইপো সম্পর্কে জরুরি কথা আছে।"

এ দুটোই যে ধাপ্পা, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না কাকাবাবুর। তিনি হাসলেন।

কেইন শিপটনকে তিনি বললেন, "তার চেয়েও জরুরি কাজে আমি ব্যস্ত আছি, ওসব কথা পরে হবে!"

কাকাবাবু আর-একটা বোতাম টিপতেই ফটাস্ করে যন্ত্রটার খানিকটা স্প্রিংয়ের ডালার মতন খুলে গেল। ভেতরটায় কাচের ঢাকা দেওয়া অনেকগুলো ঘড়ির মতন জিনিস। সেগুলোর মধ্যে ঝিকিঝিকি শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবু ওতে হাত দিলেন না। তিনি আর-একটা বোতাম টিপলেন, তখন যন্ত্রটা দিয়ে বীপ্ বীপ্ বীপ্ বীপ্ শব্দ হতে লাগল।

দরজার বাইরে থেকে কেইন শিপটন পাগলের মতন চিৎকার করছে। কাকাবাবু ওর কথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। কেইন শিপটন কেন এত ক্ষেপে যাচ্ছে তা কাকাবাবু এবার বুঝতে পারলেন। এই যন্ত্রটা বাইরে খবর পাঠায়। কাকাবাবু নানারকম বোতাম এক সঙ্গে টিপে দিলে যন্ত্রটা নানারকম উল্টোপাল্টা খবর এক সঙ্গে পাঠাতে শুরু করবে। তার ফলে, যে-দেশে এই খবরগুলো যাওয়ার কথা সেখানে বুঝে যাবে যে এখানে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কেইন শিপটন তা জানাতে চায় না।

কেইন শিপটন বলল, "রায়চৌধুরী, শোনো। তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি যদি দরজা খুলে বেরিয়ে আসো, আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তোমাকে মুক্তি দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি, হঠাৎ এত উদার হলে যে?"

"যন্ত্রটায় হাত দিও না! তুমি জানো না, ওর মধ্যে একটা বোতাম টিপলে এই পুরো জায়গাটাই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে?"

"এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?"

"আমি সত্যিই বলছি!"

"বেশ তো। তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন কোনও উপায় নেই, তখন এই পুরো জায়গাটা আমি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতেই চাই!"

"তোমাকে আমরা বাঁচার সুযোগ দিচ্ছি। তোমার ভাইপোকেও

আমরা ছেড়ে দেব !"

"আমার ভাইপো কোথায় ?"

"সে এখানেই আছে ।"

"তাকে কথা বলতে বলো । তার গলা শুনতে চাই ।"

এবার কেইন শিপটন চুপ করে গেল । তার মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে । সন্তুকে এখনও ওরা ধরতে পারেনি । সাত-আটজন লোক মিলে সন্তুকে তাড়া করলেও এখনও সন্তুকে ওরা ধরতে পারেনি । সন্তু নানান সুড়ঙ্গের মধ্যে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে ।

কেইন শিপটন তার সঙ্গীদের প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "এখনও তোমরা ছেলেটাকে ধরতে পারলে না ? অপদার্থের দল !"

কাকাবাবু একটুক্ষণ থেমে রইলেন । কেইন শিপটন যে বলল, একটা বোতাম টিপলে পুরো জায়গাটাই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে, সে-কথা কি সত্যি ? গুপ্তচরদের মধ্যে অনেক সময় এরকম ব্যাপার থাকে । ধরা দেবার বদলে তারা নিজেরাই সব কিছু ধ্বংস করে দেবার ব্যবস্থা রাখে । কিন্তু এখান থেকে পালাবার কি আর অন্য রাস্তা নেই ? কেইন শিপটনের দলবল পালাতে চাইছে না কেন ?

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "কেইন শিপটন, এবার আমি তোমাদের হুকুম দিচ্ছি, শোনো । যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, পালাও ! আমি পরপর সবকটা বোতামই টিপব শেষ পর্যন্ত !"

কেইন শিপটন বলল, "ব্লাডি ফুল, তা হলে তুমিও মরবে !"

"তোমাদের হাতে মরার চেয়ে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে মরা অনেক ভাল !"

"রায়চৌধুরী, এদিকে এসো, দরজার কাছে, প্লীজ, একটা কথা শোনো—"

কাকাবাবু এরই মধ্যে একটা অজগর সাপের ফোঁসফোঁসানির

মতন শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দ কিন্তু ওই যন্ত্রটা থেকে আসছে না। একটু লক্ষ করতেই কাকাবাবু টের পেলেন শব্দটা আসছে দরজার বাইরে থেকে। এটাও বুঝতে পারলেন, শব্দটা আগুনের। লোহা-গালানো আগুন দিয়ে ওরা দরজাটা গালিয়ে ফেলতে চাইছে। কিংবা দরজার গায়ে একটা ফুটো করতে পারলেই সেখান দিয়ে ওরা কাকাবাবুকে গুলি করতে পারবে। সেই সময়টুকু কাটাবার জন্য কেইন শিপটন কথা বলে কাকাবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে।

আর কোনও উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু যন্ত্রটার এক পাশে সরে এসে দাঁড়ালেন, দরজাটা গালিয়ে ফেললে আবার তাঁকে ধরা পড়তেই হবে। এবার আর ওরা ছাড়বে না।

তিনি বোতামগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোন্ বোতামটা সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক সেটা বোঝার উপায় নেই। কাকাবাবু নিজের মৃত্যুর জন্য চিন্তা করেন না, কিন্তু সন্তুর কথা ভেবে একটু দ্বিধা করতে লাগলেন। সন্তু এখনও ধরা পড়েনি, বিস্ফোরণে সব কিছু উড়িয়ে দিলে সন্তুও মারা পড়বে!

এখনও চোদ্দটা বোতাম টেপা বাকি আছে, এর মধ্যে সেইটা কোন্‌টা? অথচ বেশি সময়ও হাতে নেই। কাকাবাবু একটা হলুদ বোতাম টিপে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটা ব্যাপার হল যে, কাকাবাবু আনন্দে "ওঃ!" বলে উঠলেন। হলুদ বোতামটা টিপতেই মাথার ওপর সর-সর শব্দ করে ঘরের ছাদটা খুলে গেল। দেখা গেল আকাশ। কাকাবাবুর মনে হল, তিনি যেন কতকাল পরে আকাশ দেখলেন! বুক ভরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন বারবার। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল তাঁর গায়ে।

ছাদটা খুলে গেলেও দেয়ালগুলো বেশ উঁচু। কাকাবাবুর পক্ষে

লাফিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। এখনও তাঁর মুক্তি পাবার তেমন আশা নেই। কিন্তু তিনি প্রথমেই একটা কাজ করলেন।

এক হাতে তিনি তখনও কুকুরটাকে শক্ত করে ধরেছিলেন, এবার দু' হাতে কুকুরটাকে ধরে খুব জোরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "যাঃ!"

কুকুরটা বাইরে বরফের ওপর পড়ে ঘেউ-ঘেউ করে প্রচণ্ড জোরে ডাকতে লাগল।

ছুটতে-ছুটতে সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গটা এঁকেবেঁকে যে কতদূর গেছে, তার কোনও ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে আলো, মাঝে-মাঝে অন্ধকার। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল, কেউ তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে কি না। কারুকে দেখতে পেল না।

সুড়ঙ্গের পাশে পাশে দু' একটি খুপরি-খুপরি ঘর আছে। একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সন্তু। ঘরের ভেতরটায় আবছা অন্ধকার। একটুখানি চোখ সইয়ে নিয়ে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকাতেই সে আঁতকে উঠল। অজান্তেই তার মুখ দিয়ে "আঁ! আঁ!" শব্দ বেরিয়ে এল।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরপর চারটি ইয়েতি। সাধারণ মানুষের প্রায় দেড়গুণ লম্বা। যেন তারা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্রাম করছে। সন্তু ভয় পেতে না চাইলেও ধক-ধক করতে লাগল তার বুক। সে এক পা এক পা পিছিয়ে যেতে লাগল। এবং পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

কিন্তু ইয়েতিরা তাকে তাড়াও করল না, হাত বাড়িয়ে ধরবারও চেষ্টা করল না। তারা দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে।

পড়ে গিয়েও সন্তু হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। তখনই সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল খুব কাছেই, সুড়ঙ্গের একটি বাঁকে। সন্তুকে যারা ধরবার চেষ্টা করছে, নিশ্চয়ই তারা। পালাবার সময় নেই, এসে পড়বে এক্ষুনি।

তখন, বলতে গেলে এক মুহূর্তের মধ্যে দুটো-তিনটে চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। তাকে বাঁচতে হবে...বাঁচতে গেলে ওই ঘরটার মধ্যেই আবার ঢুকতে হবে...দেয়ালে পিঠ দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ইয়েতি নয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়েই একটা ইয়েতির পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তারপরই সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন লোক। তাদের মুখে হলুদ মুখোশ, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। টর্চের আলো ফেলে তারা দেখতে লাগল ঘরের ভেতরটা। একজন ঢুকেও পড়ল ঘরের মধ্যে।

বাইরের একজন ইংরেজিতে বলল, "ছেলেটা গেল কোথায়? এইদিকেই এসেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "আওয়াজ শুনলাম, মনে হল এই ঘরেই ঢুকেছে।"

আর-একজন বলল, "না, আমার মনে হয় ছেলেটা ওপরে উঠে গেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "এখানে তো দেখছি না—"

বাইরের একজন বলল, "একবার ওপরে যাওয়া উচিত, ওপরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু—"

লোকগুলো জুতোর দুপদাপ শব্দ করে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের সামনের দিকে।

এই সময়টুকু সন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। তার খালি ভয় হচ্ছিল, তার পা দুটো ওরা দেখতে পেয়ে যাবে কি না। লোকগুলো চলে যেতেই তার শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল, সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘরটার মেঝেতে খড় ছড়ানো আছে। ইয়েতির মতন পোশাকগুলোতেও খড় ভরাই ; পোশাকগুলো যাতে কুঁচকে না যায়, সেইজন্য খড় ভরে সোজা করে রাখা আছে। সন্তু একটু সুস্থ হবার পর পোশাকগুলোতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। প্রথম দেখেই সন্তু এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে ভাল করে তাকায়নি। নইলে চোখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারা যেত। ওদের চোখের জায়গায় কিছুই নেই। শুধু দুটো গর্ত।

সন্তুর একবার ইচ্ছে হল, সে এই একটা পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইয়েতি সেজে থাকবে। তা হলে ওরা আর তাকে কিছুতেই খুঁজে পাবে না ! কিন্তু পোশাকগুলোর তুলনায় তার চেহারা অনেক ছোট। তাছাড়া... সন্তুর আর-একটা কথা মনে পড়ল, ওপরে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে, কাকাবাবু তো তার মতন আর ছুটে পালাতে পারবেন না। কাকাবাবুকে ওরা এতক্ষণে মেরে ফেলেছে ! যাই হোক না কেন, তাকে একবার ওপরে যাবার চেষ্টা করতেই হবে।

ঘরটা থেকে খুব সাবধানে বেরুল সন্তু। দু পাশে উঁকি দিয়ে দেখল, কেউ নেই। লোকগুলো তাহলে ওপরেই উঠে গেছে বোধহয়। সুড়ঙ্গটা দিয়ে পা টিপে টিপে খানিকটা গিয়ে সন্তু বুঝতে পারল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুড়ঙ্গটার দু'পাশ দিয়েই মাঝে-মাঝে দু'-একটা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। এর আগে ছুটে আসবার সময় সে কখন কোনটা দিয়ে এসেছে, তা এখন আর বোঝবার উপায় নেই।

আবার আর-একটা ঘর চোখে পড়ল একপাশে। সে-ঘরটার কোনও দরজা নেই। ভেতরে কী রকম যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। একটু উঁকি দিয়ে দেখল সন্তু। ঘরটার ভেতরে একটা খাঁচার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো জ্যান্ত মুর্গি, তাছাড়া পাশাপাশি দুটি রেফ্রিজারেটর, মেঝের এক কোণে স্তূপাকার আলু আর পেঁয়াজ। এটা এদের ভাঁড়ারঘর। সন্তুর মনে পড়ল, ওপরে গম্বুজের বাইরে একদিন মুর্গির পালক আর রক্ত দেখতে পেয়েছিল। এরাই ওখানে একদিন একটা মুর্গি নিয়ে গিয়ে মেরে তাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।

সেখানে বেশিক্ষণ রইল না সন্তু, তাকে ওপরে যেতেই হবে। আবার সুড়ঙ্গপথে এগোতে লাগল সে। যেদিকে আলো দেখছে, সেদিকেই যাচ্ছে, তা ছাড়া পথ চেনার আর কোনও উপায় নেই।

আর-একটা ঘরের কাছাকাছি গিয়ে থমকে যেতে হল সন্তুকে। সে-ঘরের ভেতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর জোরে-জোরে নিশ্বাস টানার শব্দ।

সে-ঘরটাতেও কোনও দরজা নেই। ওই ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে সন্তুকে। ভেতরের লোকরা যদি তাকে দেখে ফেলে ? সন্তু পেছন ফিরে তাকাল, আবার ওই দিকে যাবে ? কিন্তু সামনের দিকটাতেই বেশি আলো, খুব সম্ভবত ওই দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দটা শুনতে লাগল সন্তু। কীরকম যেন "কুঁ-কুঁ" আওয়াজ হচ্ছে, তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন। মনে হয় কোনও অসুস্থ লোক। এটা কি ওদের হাসপাতাল-ঘর ? তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই, অসুস্থ লোকেরা তাকে দৌড়ে ধরতে পারবে না।

সাহস করে ঘরটায় উঁকি মারল সন্তু। আবার বুকটা কেঁপে

উঠল তার। ওখানে কারা বসে আছে, মানুষ না ভূত ? শুধু জাঙ্গিয়া-পরা দু' জন লোক দরজার সোজাসুজি দেয়ালের কাছে বসে আছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষের কঙ্কাল। তারা নিশ্বাস ফেলছে আর "কুঁ কুঁ" শব্দ করছে বলেই বোঝা যায় তারা বেঁচে আছে।

লোক দুটির চোখের দৃষ্টি স্থির, তারা চেয়ে আছে সন্তুর দিকে। একজনকে দেখে মনে হয় চিনেম্যান, অন্যজন কোন জাত তা বোঝবার উপায় নেই। তার মুখে লম্বা ঝোলা দাড়ি।

সন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "হু আর ইউ ?"

লোক দুটি কোনও উত্তর দিল না, একভাবে চেয়েই রইল।

ওদের দেখে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল সন্তুর। ওরা যেন দারুণ অসহায়, বুকের মধ্যে শুধু প্রাণটা ধুকপুক করছে। ওরা নিশ্চয়ই এই গুপ্তচরদের দলের লোক নয়। এই রকমই একজন চিনেম্যানের মৃতদেহ সন্তু দেখেছিল গম্বুজের বাইরে।

এক পা এগিয়ে এসে সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "কে ? আপনারা কে ? আপনাদের কী হয়েছে ?"

লোক দুটির কথা বলার কোনও ক্ষমতা নেই। এই লোক দুটিকেও না খেতে দিয়ে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেলে তারপর ওদের দেহ ওপরে বরফের ওপর ফেলে রেখে আসা হবে। তখন কেউ ওদের খুঁজে পেলেও ভাববে, বরফের রাজ্যে পথ হারিয়ে ফেলে ওরা না খেতে পেয়ে মরেছে।

কিন্তু সন্তু এসব কথা জানে না। সে ওদের কোনও রকম সাহায্যও করতে পারছে না। এখানে দেরি করাও অসম্ভব, তাকে ওপরে যেতেই হবে কাকাবাবুর কাছে।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লোক দুটো যেন আরও জোরে

জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল তারপর। বেশ খানিকটা এগিয়েও ওদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সন্তু। সে দু'হাতে কান চেপে ধরল।

ক্রমেই সুড়ঙ্গের সামনের দিকে আলো বাড়ছে, মানুষের গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। কান থেকে হাত সরিয়ে সন্তু ভাল করে শোনবার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউ যেন কাকে খুব ধমক দিচ্ছে। ওই আওয়াজটা আসছে ওপরের দিক থেকে। লোহার সিঁড়িটা তা হলে ওই দিকেই হবে।

একা-একা অতজন শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হয়ে সন্তু কী করবে, তা সে জানে না। কিন্তু কাকাবাবু ওখানে আছেন, তাকে তো যেতেই হবে। এক পা এক পা করে সে এগোতে লাগল। এবার খানিকটা দূরে দেখা গেল নীল রঙের আলো। ওইখানে কাচের বাক্সের মধ্যে গোল যন্ত্রটা আছে, সে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। ক্রমশ ওপরের কথাগুলোও শোনা যেতে লাগল স্পষ্ট।

একজন কেউ বলছে, "ওপন দা ডোর...তোমার ভাইপো এখানে আছে। দরজা না খুললে তাকে মেরে ফেলব !"

শুনেই সন্তু বুঝতে পারল, ভাইপো মানে তার কথাই বলা হচ্ছে। কাকাবাবু তা হলে এখনও বেঁচে আছেন। ওরা কাকাবাবুকে মিথ্যে বলছে যে, সন্তু ধরা পড়েছে। তবে কি এখন সন্তুর ওখানে যাওয়া উচিত ? সন্তুকে ধরতে পারলে তো ওদের এখন সুবিধেই হবে। কাকাবাবুকে ভয় দেখিয়ে দরজা খোলাতে পারে। এখন তার পক্ষে লুকিয়ে থাকাই ভাল।

আর-একটু এগিয়ে সন্তু আরও কথা শোনবার চেষ্টা করল। কাকাবাবুর গলার আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে না। কেইন শিপটন একাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনেক কথা বলছে, তার মধ্যে একটা যন্ত্রে হাত দিতে বারবার নিষেধ করছে কাকাবাবুকে। যন্ত্রটা কোথায়

আছে!

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে লোহার সিঁড়ি দিয়ে চারজন মুখোশধারী আবার নেমে এল নীচে। সন্তু পেছন ফিরে ছুট লাগাবার আগেই তাদের টর্চের আলো এসে পড়ল তার গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের হাতে রিভলবার আছে, ওরা দেখামাত্র গুলি করবে। সন্তু এটা শিখে রেখেছে যে মাটিতে শুয়ে পড়লে সহজে গায়ে গুলি লাগে না।

লোকগুলো দৌড়ে আসতে লাগল তার দিকে। তাদের মধ্যে একজন হুকুম দিল, "ডোনট শুট! গেট হিম অ্যালাইভ!"

এই কথা শোনামাত্রই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল। গুলি না করে ওরা তাকে জ্যান্ত ধরবে। আসুক তো কেমন ওরা দৌড়ে ধরতে পারে!

লোকগুলো টর্চের আলো ফেলে রেখেছে সন্তর ওপর। সন্তু চায় একটা অন্ধকার জায়গা। ডানদিকের আর একটা শাখা-সুড়ঙ্গ দেখে সন্তু বেঁকে গেল সেদিকে। সেদিকটা অন্ধকার। এটা যদি বন্ধ গলি হয়, তা হলে আর সন্তর নিস্তার নেই। তবু তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।

একটুখানি যেতে-না-যেতেই সন্তর মুখে টর্চের আলো পড়ল। সামনে দিয়ে দু' তিনজন তেড়ে আসছে। লোকগুলো এরই মধ্যে এদিকে এসে পড়েছে। পেছনে ফিরে সন্তু উল্টোদিকে ছুটতে গিয়েই দেখল বাঁকের মাথায় টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন!

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সন্তু একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। সে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না, কিছুতেই না। অথচ আর কোনও উপায় নেই, পালাবার পথ

নেই। এই সুড়ঙ্গটার পাশে কোনও ঘরও নেই। দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে দু দল মুখোশধারী। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "না, আমায় ধরতে পারবে না, কিছুতেই না!"

আর তখনই ওপরে বিরাট জোরে একটা শব্দ হল। এত জোর শব্দ যেন কানে তালা লেগে যায়। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন সব কিছু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। এই সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকেও দু' চারটে পাথরের চালটা ছিটকে গেল চারদিকে।

গম্বুজের জানলাটার কাছেই বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রানা, সেইরকমভাবেই কেটে গেছে সারারাত। টমাস ত্রিভুবন এসে ঘুমিয়ে ছিলেন নীচে। ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠলেন তিনিই আগে। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে চা বানালেন, তারপর এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ডাকলেন রানাকে।

রানা আড়মোড়া ভেঙে চোখ কচলে বাইরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "লুক, টমাস, লুক!"

টমাস ত্রিভুবন তাড়াতাড়ি এসে মুখ বাড়ালেন জানলা দিয়ে। তিনিও চমকে উঠলেন প্রথমে।

ইয়েতিরা লোফালুফি করে কিছুক্ষণ খেলবার পর মিংমাকে ফেলে গিয়েছিল মাটিতে। তখন রানা আর ত্রিভুবন ধরেই নিয়েছিলেন যে, মিংমা আর বেঁচে নেই। কিন্তু মিংমা কখন যেন

উঠে বসেছে। রাত্রে কোনও এক সময় বরফ পড়েছিল। সেই বরফ জমে আছে মিংমার মাথায়, কাঁধে, পিঠের ওপর। এমনই নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে মিংমা যে, মনে হয় যেন রাত্রিতে ঠাণ্ডায় জমে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে।

রানা জিভ দিয়ে আফশোসের শব্দ করে বললেন, "পুয়োর ফেলো, আহা বেচারা!"

ত্রিভুবন বললেন, "মরে গেছে ভাবছেন ? আমার কিন্তু তা মনে হয় না!"

"সারারাত বাইরে বরফের মধ্যে পড়ে থাকলে কেউ বাঁচতে পারে ?"

"শেরপাদের কতখানি জীবনীশক্তি তা বোধহয় আপনি ঠিক জানেন না। আমি ওদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি তো, আমি দেখেছি, ওরা মৃত্যুর কাছে কিছুতেই হার মানতে চায় না।"

তিনি দুটো হাত মুখের কাছে এনে খুব জোরে চিৎকার করলেন, "মিংমা! মিংমা! মি-ং-মা!"

মিংমার শরীরটা একটুও নড়ল না তাতে। তখন ত্রিভুবন ও রানা দুজনে মিলে একসঙ্গে ডাকতে লাগলেন মিংমার নাম ধরে। তাতেও কাজ হল না কিছুই।

ত্রিভুবন বললেন, "একটা বন্দুক বা রিভলবার দিয়ে যদি ফায়ার করা যেত, তাহলে সেই শব্দ শুনে ও জাগত নিশ্চয়ই।"

রানা হতাশভাবে বললেন, "বৃথা চেষ্টা! ওই রকমভাবে কোনও মানুষ বসে থাকে ? দেখছেন, একটুও নড়ছে না!"

ত্রিভুবন কোনও কথা না বলে নেমে গেলেন নীচে। একটু পরেই তিনি একটা সাঁড়াশি, একটা ছোট হাতুড়ি, কয়েকটা চীজ-ভর্তি টিন হাতে ওপরে উঠে এলেন আবার। রানাকে বললেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, ঠিক ছুঁড়তে পারব না, আপনি

এগুলো টিপ্ করে ছুঁড়ে মিংমার গায়ে লাগাতে পারবেন ? মিংমা যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে তো আমাদের এখান থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায়ই নেই।"

রানা জানলাটার একটা কাচের পাল্লা খুলে দিলেন ভাল করে। খুব ঘন-ঘন লোহার শিক বসানো বলে ভাল করে বাইরে হাত বাড়ানো যায় না। এই অবস্থায় এখান থেকে কিছু টিপ করে বাইরে ছোঁড়া খুবই শক্ত।

তবু রানা খুব সাবধানে টিপ করে একটা চীজের টিন ছুঁড়ে মারলেন। সেটা গিয়ে পড়ল অনেক দূরে। পর-পর তিন-চারটে জিনিসই সেরকম হল।

ত্রিভুবন বললেন, "আপনি একটু সরুন তো, দেখি আমি একবার চেষ্টা করি।"

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ত্রিভুবন ছুঁড়ে মারলেন সাঁড়াশিটা। সেটা গিয়ে ঠিক লাগল মিংমার পিঠে। খানিকটা বরফও খসে পড়ল, কিন্তু মিংমার শরীরে কোনও স্পন্দন দেখা গেল না।

রানা ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "আঘাতটা তেমন জোর হয়নি, আরও জোরে মারতে হবে।"

আরও তিনবার চেষ্টা করার পর আবার একটা টিন লাগল মিংমার মাথায়। তখন তার শরীরটা ধপ করে পড়ে গেল বরফের ওপরে।

ত্রিভুবন আর রানা সঙ্গে-সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডেকে উঠলেন, "মিং-মা ? মিং-মা ?"

মিংমা আস্তে আস্তে মুখটা ফেরাল এবার।

আনন্দে, উত্তেজনায় রানার হাত চেপে ধরে ত্রিভুবন বলে উঠলেন, "দেখলেন, দেখলেন, আমি আপনাকে বলেছিলুম

না...শেরপাদের জীবনীশক্তি !"

রানা চেঁচিয়ে উঠলেন, "মিং-মা, মিং-মা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ ? গম্বুজের দরজাটা খুলে দাও ।"

শোয়া অবস্থা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল মিংমা । দেখলেই বোঝা যায়, তার শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই । দু'হাত তুলে সে কী যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু এতই ক্ষীণ তার গলার আওয়াজ যে, কিছুই বোঝা গেল না ।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, লক্ষ্মী ভাইটি, একটু কষ্ট করে এসে, দরজা খুলে বার করে দাও আমাদের ।"

মিংমা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল ধপ করে ।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, চেষ্টা করো, তোমাকে পারতেই হবে, গম্বুজের মধ্যে এলে তুমি আগুনের সেঁক নেবে, গরম চা পাবে, ব্র্যান্ডি, ওষুধ..."

মিংমা দাঁত চেপে দুই কনুইতে ভর দিয়ে উপুড় হল, তারপর সেই অবস্থায় বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করল গম্বুজের দিকে । তিন চার ফুট কোনওক্রমে সেইভাবে এসেই আবার নেতিয়ে গেল তার মাথা, শুয়ে পড়ল কাত হয়ে ।

রানা বললেন, "যাঃ, শেষ হয়ে গেল !"

ত্রিভুবন বললেন, "না, বিশ্রাম নিচ্ছে ! একটু বেশি সময় লাগলেও ক্ষতি নেই ।"

সত্যিই খানিকটা পরে ফের মুখ তুলল মিংমা । আবার সেইভাবে এগুবার চেষ্টা করল । একটুখানি যায়, আবার বিশ্রাম নেয় । এইরকমভাবে গম্বুজের কাছাকাছি এসে পড়ে একবার সে বিশ্রামের জন্য সেই যে মাথা নোয়াল, আর তোলেই না । কেটে গেল দশবারো মিনিট । অধীর উৎকণ্ঠায় রানা আর ত্রিভুবন যেন

আর থাকতে পারছেন না । রানা তাঁর ঠোঁট এমনভাবে কামড়ে ধরেছেন যেন রক্ত বেরিয়ে যাবে ।

ত্রিভুবন বললেন, "কী হল, মিংমা ? আর একটুখানি !"

মুখ তুলে অসহায় চোখ দুটি মেলে মিংমা বলল, "আমি আর পারছি না, সাব ! আমার শরীরে আর একটুও তাগত নেই !"

রানা বললেন, "পারতেই হবে, মিংমা ! একটু-একটু করে এসে, দরজাটা খুলে দিলে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বাঁচব !"

মিংমা প্রাণপণে খানিকটা চেষ্টা করেও এমনভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ে গেল যে, বোঝা যায়, ওর জ্ঞান চলে গেছে !

ত্রিভুবন বললেন, "ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু মানুষের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে !"

"অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই ।"

দু'জনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিংমার দিকে । শরীরটা একটুও নড়ছে না, বুকের নিশ্বাস পড়ছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না ।

ত্রিভুবন বললেন, "এরকমভাবে চেয়ে থাকতে-থাকতে যে আমাদের চোখ ব্যথা হয়ে যাবে ! দাঁড়ান, আর একটু চা করে আনি—"

ত্রিভুবন নীচে নামবার জন্য ফিরতেই রানা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, "দাঁড়ান, শুনতে পাচ্ছেন ?"

"কী ?"

"শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না ?"

"কই, না তো ! কিসের শব্দ শুনব এখানে ? বেশি উত্তেজিত হয়ে মাথাটা খারাপ করবেন না । ধৈর্য ধরা ছাড়া আমাদের আর এখন কোনও উপায় নেই !"

"ওই যে শুনুন, ভাল করে শুনুন !"

এবার সত্যিই শোনা গেল গোঁ গোঁ আর ফট ফট ফট ফট শব্দ। খুব তাড়াতাড়ি সেই শব্দ কাছে এসে পড়ল। তারপরই দেখা গেল দুটো হেলিকপ্টার।

রানা আর ত্রিভুবন আনন্দে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুটো হেলিকপ্টার থেকে এগারোজন মিলিটারি নেমেই সারবন্দী হয়ে ছুটে আসতে লাগল গম্বুজটার দিকে। ত্রিভুবন আর রানা জানলা দিয়ে রুমাল ওড়াতে লাগলেন ওদের চোখ টানবার জন্য।

গম্বুজের দরজাটা খুলে যেতেই আগে কোনও কথা না বলে ওঁরা দু'জন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এলেন মিংমাকে। ভেতরে এসেই মিংমার ঠোঁট ফাঁক করে তার গলায় ঢেলে দিলেন খানিকটা ব্র্যান্ডি। সস্প্যানে করে গরম জল ঢালতে লাগলেন তার গায়ে। মিলিটারিদের মধ্যে দু'জন মিংমার বুকে ম্যাসাজ করে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগল।

ত্রিভুবন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক্, বেঁচে যে আছে, তাই যথেষ্ট। আর কোনও চিন্তা নেই।"

বীরেন্দ্র নামে একজন ব্রিগেডিয়ার দশজন কমান্ডো নিয়ে এসেছেন বিপদ থেকে উদ্ধারের কাজে। এই কমান্ডোদের এমনই ট্রেনিং যে, এরা এক-এক-জনই অন্তত দশ-পনেরোজনের সমান লড়াই করতে পারে। এরা জানে না এমন কোনও কাজ নেই।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমাদের লাইন অব অ্যাকশান কী হবে, বলুন?"

ত্রিভুবন বললেন, "আমি যতদূর বুঝেছি, এখানে এক জায়গায় বেশ বড় কয়েকটা গুহা ছিল, আমি নিজেও দেখে গেছি এক

সময়। এখন সেই গুহাগুলো নেই। কোনও ফরেন এজেন্সি সেই গুহাগুলো ঢেকে দিয়ে মাটির নীচে গুপ্ত আস্তানা বানিয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরী আর সন্তু সেখানে বন্দী। মিংমা একটা লোহার দরজার কথা বলেছিল, সেটা ব্লাস্ট করে ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনাদের সঙ্গে ডিনামাইট আছে কি?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "পাহাড়ে রেসকিউ অপারেশনে এসেছি, আর ডিনামাইট স্টিক সঙ্গে থাকবে না, এ আপনি ভাবলেন কী করে?"

রানা বললেন, "কিন্তু সেই লোহার দরজাটা খুঁজে বার করার জন্য মিংমার সাহায্য দরকার।"

ওঁরা সবাই মিংমার দিকে তাকালেন। মিংমা চোখ মেলেছে।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, তুমি যে আমাদের সেই লোহার দরজাটার কথা বলেছিলে, সেটা কোন্ জায়গায় দেখিয়ে দিতে পারবে?"

মিংমা বললেন, "হ্যাঁ, পারব।"

তারপরই তার চোখে জল এসে গেল। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল, "আপনারা সন্তু সাব, আর আংকল সাবকে বাঁচান। আমি উঠতে পারছি না। আমার দুটো পা থেকেই জোর চলে গেছে! আমি আর কোনওদিন হাঁটতে পারব না।"

ত্রিভুবন বললেন, "নিশ্চয়ই পারবে! দু' একদিন বিশ্রাম নিলে আর ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমরা তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব, তুমি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও!"

দু'জন কমান্ডো মিংমাকে কাঁধে তুলে নিল। ওরা বেরিয়ে পড়ল সবাই। এত অসুস্থ অবস্থাতেও মিংমা জায়গাটা চিনতে ভুল করল না। কাল রাতে বরফ পড়ে সব জায়গা প্রায় একাকার হয়ে গেছে। সকালের রোদ্দুরে কিছু বরফ গলতেও শুরু করে

দিয়েছে।

মিংমার দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটায় কয়েকজন কমান্ডো বরফ খুঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল লোহার দরজাটা। চটপট সেই দরজাটার চারদিকে বসিয়ে দেওয়া হল চারটে ডিনামাইট স্টিক। মিংমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অনেক দূরে। অন্যরাও ছড়িয়ে পড়ল দূরে-দূরে। ডিনামাইট চার্জ করার পর কতদূর পর্যন্ত ছিটকে আসতে পারে তা হিসেব করে কমান্ডোরা সবাইকে সেই নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বলল। কয়েকজন কমান্ডো তৈরি হয়ে রইল হাতের মেশিনগান উঁচিয়ে।

রানা আর ত্রিভুবন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন। ডিনামাইট চার্জ করার আগেই তাঁরা কানে হাত চাপা দেবার জন্য তৈরি। ঠিক এই সময় তাঁরা শুনতে পেলেন পেছন দিকে একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক।

দু'জনেই দারুণ চমকে গেলেন। এই বরফের রাজ্যে কুকুর? পেছন দিকে তাকিয়ে তাঁদের মনে হল, সেখান থেকেও বেশ খানিকটা দূরে একটা কুকুর প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে।

ত্রিভুবন বললেন, "কুকুর যখন আছে, তখন মানুষও আছে ওখানে!"

তাঁর কথা বলা শেষ হতে না হতেই ডিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল।

ওদিকে গুহার মধ্যে কাকাবাবু যে যন্ত্র-ঘরটার মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে-ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কেইন শিপটন অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আগুনে সেই লোহার দরজার একটা অংশ গলিয়ে ফেলেছে। লম্বা নলওয়ালা একটা পিস্তল হাতে নিয়ে প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কেইন শিপটন। তার পেছনে অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে একজন

মুখোশধারী সহচর।

ঘরের ছাদটা খোলা দেখে রাগে-ক্ষোভে একসঙ্গে অনেকগুলো গালাগালি দিয়ে উঠল কেইন শিপটন! তার প্রিয় কুকুরটা বাইরে, ওপরে চ্যাঁচাচ্ছে।

সে বলে উঠল, "ড্যাম ইট! দ্যাট ফেলো এসকেপ্ড! ওই বদমাস রায়চৌধুরীটাকে ক্যাপচার করতেই হবে! ও যেন কিছুতেই পালাতে না পারে।"

তারপর সহচরটিকে হুকুম দিল, "শিগগিরই নাম্বার ফোর, নাম্বার সেভেন আর নাম্বার নাইনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। বাইরে যেতে হবে।"

সহচরটি চলে যেতেই কেইন শিপটন শিস দিয়ে ডাকল, "ডোগি, ডোগি, কাম হিয়ার।"

কুকুরটা কিন্তু ডাকতে-ডাকতে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

কেইন শিপটনের লম্বা ছিপছিপে চেহারা, সে ইচ্ছে করলেই লাফিয়ে খোলা ছাদের এক পাশের দেয়াল ধরে ফেলতে পারে। সেই রকমই করবার জন্য তৈরি হয়ে সে পিস্তলটাকে দাঁতে কামড়ে ধরল, তারপর লাফ দেবার জন্য যেই নিচু হয়েছে, অমনি পেছন থেকে শক্ত লোহার মতন দুটো হাত টিপে ধরল তার গলা।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে, কিছু বুঝবার আগেই যেন কেইন শিপটনের দম বন্ধ হয়ে এল, মাথা ঝাঁকুনি দিয়েও সে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না নিজেকে। চোয়াল আল্‌গা হয়ে গিয়ে পিস্তলটা ঠকাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার কানের পাশে ঠাণ্ডা গলায় কে একজন বলল, "ইয়োর গেম ইজ আপ্, কেইন্ শিপটন!"

রহস্যময় যন্ত্রটার পাশে অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাকাবাবু। ঘরের ছাদটা খুলে গেলেও খোঁড়া পায়ে কাকাবাবু

লাফিয়ে উঠতে পারতেন না ওপরে। তিনি ঠিকই করে রেখেছিলেন, ঘরে ঢুকে কেইন শিপ্‌টন তাঁকে দেখা মাত্র তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন যন্ত্রটার ওপরে, এক সঙ্গে সব কটা বোতাম টিপে দেবেন। তাতে সব সুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক্।

কিন্তু ছাদটা খোলা দেখে, বিশেষত বাইরে কুকুরের ডাক শুনে কেইন শিপ্‌টন আর ঘরের ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখেনি। একটু অসতর্কও হয়ে পড়েছিল সে। সেই সুযোগ নিয়ে কাকাবাবু বজ্র আঁটুনি দিয়েছেন তার গলায়।

কাকাবাবু টেনে কেইন শিপটনকে দেয়ালের দিকে নিয়ে আসতে লাগলেন। কেইন শিপটনের গায়েও জোর কম নয়। তার সঙ্গে কাকাবাবু বেশিক্ষণ যুঝতে পারবেন না। কোনওক্রমে একবার মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নিতে পারলেই হল।

কেইন শিপটনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে শরীরের সব শক্তি এক জায়গায় করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে গেল একবার।

তার আগেই প্রলয় কিংবা মহাভূমিকম্পের মতন প্রচণ্ড শব্দে সব কিছু কেঁপে উঠল, কাকাবাবু আর কেইন শিপটন দু'জনে ছিটকে পড়লেন দু'দিকে।

ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়তে লাগল, ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব-কিছু। এক মুহূর্তের জন্য কাকাবাবুর মনে হল তিনি যেন পাথরের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছেন, তারপরই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

ডিনামাইট চার্জে ওপরের ইস্পাতের দরজাটা উড়ে যেতেই গুহার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেল কমান্ডোরা। প্রথমে তারা সাবমেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি চালাল, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল নিজেরা।

বিস্ফোরণের আওয়াজের ভেতরের মুখোশধারী লোকগুলো

একটুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। দু'তিনজন পাথরের টুকরোর ঘা খেয়ে আহত হল। তারপরই কমান্ডোরা এসে পড়ায় শুরু হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু কমান্ডোরা ভেতরে ঢুকতে লাগল যেন ঝড়ের বেগে, কয়েকজন মুখোশধারী আহত হবার পর বাকিরা আত্মসমর্পণ করতে লাগল একে একে।

সন্তুকে যারা ধরতে এসেছিল, তারা আরও অনেকখানি নীচে ছিল বলে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি প্রথমে। দু'জন সন্তুকে ধরে রইল, রিভলবার দিয়ে সাব-মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না বুঝতে পেরে তারা রিভলবার ফেলে দিয়ে দু'হাত উঁচু করে ধরা দিল।

সন্তুর কাছে যে দু'জন রইল, তাদের একজন সন্তুর ডানপাশ থেকে তার কপালের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছে। আর একজন রিভলবার উঁচিয়ে রইল সন্তুর পেছনে। তারপর পেছনের লোকটি সন্তুকে হুকুম দিল, "নাউ মুভ, ওয়াক স্ট্রেট অ্যাহেড, কোনও রকম চালাকি করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাব।"

সন্তু এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেল বলে তার মন খারাপ লাগছে। ওপরে কারা গোলাগুলি চালিয়েছে, তাও সে ঠিক বুঝতে পারেনি। সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল কমান্ডোদের।

একজন মুখোশধারী চেঁচিয়ে বলল, "ইফ ইউ ট্রাই টু হোল্ড আস্, উই উইল শূট দিস বয়। আমাদের রাস্তা ছেড়ে দাও, নইলে এই ছেলেটা আগে মরবে!"

কমান্ডোরা থমকে গেল। মুখোশধারীদের হুকুমে সন্তু উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। একবার সে চোখ তুলে দেখতে পেল রানাকে। এই একজন চেনা লোককে মিলিটারিদের সঙ্গে দেখেই সে সব বুঝতে পারল।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্রর কানে-কানে রানা কী যেন বললেন। বীরেন্দ্র ঘাড় নাড়লেন। মুখোশধারীরা সন্তুকে নিয়ে চলে এল ওঁদের কাছে। একজন বলল, "আমরা এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাব। তোমরা আটকাবার চেষ্টা করলেই ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী কোথায়?"

সন্তুই উত্তর দিল, "কাকাবাবু ওই বাঁ দিকের ঘরটার মধ্যে আছেন বোধহয়।"

রানা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "সন্তু, ভয় পেও না, ঠিক সাত পা যাবার পর তুমি মাটিতে বসে পড়বে।"

সন্তুর মাথার পাশে আর পেছনে দুটো রিভলবার। সে পা গুনতে লাগলো, এক...দুই...তিন...চার...

সাত গোনার পর সে বসে পড়তেই এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। সন্তুর ধারণা হল, সে নিজেও বুঝি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলিতে। মাটিতে তিন পাক গড়িয়ে গেল সে। তারপরই উঠে দাঁড়াল, তার কিছু হয়নি। মুখোশধারী দু'জন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

সেদিকে তাকাবার সময় নেই সন্তুর, সে ছুটে এল রানার দিকে। রানা আর ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জনেই বললেন, "তোমার লাগেনি তো? যাক—"

রানা বললেন, "সেই বিশ্বাসঘাতক ভামটা কোথায়? এখানেই আছে নিশ্চয়, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সন্তু ঢুকে গেল উঁচু বেদী মতন জায়গাটার পাশের ঘরটায়। এইখানে দাঁড়িয়েই কেইন শিপটন কাকাবাবুকে ভয় দেখাচ্ছিল। রানা আর বীরেন্দ্রও সন্তুর সঙ্গে সঙ্গে এলেন সেই ঘরটার মধ্যে।

ঘরের ছাদটা খোলা দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল প্রথমেই। তারপরই ওরা দেখতে পেল একটা বিশাল যন্ত্রের ঠিক সামনে কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর গায়ের ওপর ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো দেয়াল-ভাঙা পাথরের টুকরো।

সন্তু হাঁটু গেড়ে বসে ডাকছিল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দিতেই কাকাবাবু চোখ মেললেন। তারপরই উঠে বসে বললেন, "সে কোথায় গেল? কেইন শিপটন?"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "সে কে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো পালের গোদা! এখানেই ছিল, তাকে কাবু করেছিলুম প্রায়-তারপর...কুকুরটাও ডাকছে না আর...সে নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে পালিয়েছে..."

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জন কমান্ডোকে এ-ঘরে ডেকে আনলেন। তারা চটপট লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে। ওপর থেকে জানাল যে, সেখানে একজন মানুষের পায়ের ছাপ আছে বরফের ওপরে।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "তাহলে তো ওকে ধরতেই হবে। কিছুতেই পালাতে দেওয়া চলবে না! আর ইউ অল রাইট, মিঃ রায়চৌধুরী? কেইন শিপটনকে ধরবার জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকাবাবু বললেন, "না! আমি আর যাব না, যথেষ্ট হয়েছে!"

রানা বললেন, "আমরাও ওপরে একটা কুকুরের ডাক শুনেছিলুম বটে...সেদিকে আর মন দিতে পারিনি...অবশ্য এখানে একা-একা কেইন শিপটন আর পালাবে কী করে? ধরা সে পড়বেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ধরা পড়ুক না পড়ুক, সে-সব এখন

আপনাদের দায়িত্ব। আমি চেয়েছিলাম ওদের গোপন আস্তানাটা খুঁজে বার করতে সেটুকু তো অন্তত পেরেছি! সেটুকুই যথেষ্ট!"

এতক্ষণ বাদে তিনি যেন সন্তুকে দেখতে পেলেন। সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই ঠিকঠাক আছিস তো সন্তু? লাগেনি তো তোর? বাঃ! এখনও তোর একটা কাজ বাকি আছে। খুঁজে দ্যাট তো আমার ক্রাচ দুটো কোথায়? কাছাকাছিই কোথাও হবে হয় তো!"

রানা বললেন, "আপনার ওই ভার্মা লোকটা কী করেছে জানেন? সে যে এদেরই দলের লোক, তা বুঝেছিলেন?"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "থাক, ওসব কথা পরে শুনব। এখন কোনওভাবে একটু চা খাওয়াতে পারেন? মনে হচ্ছে কতদিন যেন চা খাইনি! এ ব্যাটাদের এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে কি না বলতে পারেন?"

রানার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনি বলেন কী, মিঃ রায়চৌধুরী! এত গোলাগুলি, মারামারির মধ্যে আমি চায়ের খোঁজ করব?"

কাকাবাবুর যেন এখন আর অন্য কোনও বিষয়েই কোনও আগ্রহ নেই। তিনি আবার বললেন, "এখন একটু চায়ের জন্য মনটা খুব ছটফট করছে। ওপরে আমাদের গম্বুজে স্টোরে ভাল চা আছে। চলুন, সেখানে গিয়ে আমি চা তৈরি করে খাওয়াব। তারপর আমি কয়েক ঘন্টা বেশ ভাল করে ঘুম লাগাব। যথেষ্ট ধকল গেছে, এবার একটু ঘুম দরকার। বুঝলেন, মিঃ রানা, ঘুমের মতন এমন ভাল জিনিস আর কিছু নেই। আমি তো অলস ধরনের লোক, ঘুমোতে খুব ভালবাসি!"

রানা এবার জোরে হেসে উঠে বললেন, "যা বলেছেন! আপনি অলসই বটে! খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয়ের এতখানি ওপরে এসে

আপনি একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "পঙ্গুরাও গিরি লঙ্ঘন করে, এমন একটা কথা আছে জানেন না ?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র তাঁর কমান্ডোদের নানারকম নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন। কয়েকজন এরই মধ্যে চলে গেছে কেইন শিপটনের খোঁজে। তিনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে মোট কতজন লোক ছিল, আপনি বলতে পারেন ? ঢোকার-বেরুবার রাস্তা কোথায় ? ওরা কি আপনার ওপর টর্চার করেছে ?"

কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "এখন নয়, এখন ওসব কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না। বললুম না, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে, আর ঘুম পাচ্ছে।"

এই সময় সন্তু ক্রাচ দুটো খুঁজে এনে দিতেই তিনি খুব খুশি হয়ে উঠে বললেন, "বাঃ, আর কী চাই ! চমৎকার ! চলুন, মিঃ রানা। এবার ওপরে গিয়ে পৃথিবীটাকে একটু ভাল করে দেখি, একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই ! চল রে, সন্তু ! তুই এবার দারুণ কাণ্ড করেছিস !"

কাকাবাবু আদর করে এক হাতে সন্তুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন।